শরতের নাগরিক

দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

প্রথম বর্ষ * ১৫ তম সংখ্যা * ৭ অক্টোবর ২০২৪

* এই সংখ্যায় থাকছে *

* জমিদার রবীন্দ্রনাথ ২
* রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমান ৩
* পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ৭
* দুটি মানবতার পাঠশালার ইতিবৃত্ত ৯
* সুচিত্রা মিত্র ১২
* মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধকে কোনো শক্তি ধ্বংস করতে পারবে না ১৪
* বাংলাদেশ কি মিশর হতে যাচ্ছে ১৬
* স্ফুলিঙ্গের সন্ধানে এক বিজ্ঞানী ১৭
* আরজি কর কাণ্ড অভূতপূর্ব ঘটনায় নজিরহীন প্রতিক্রিয়া ২০
* ভিয়েতনামের ডায়েরি -১ ২২
* তাজমহল ঃ বিকৃত ইতিহাস প্রচার বনাম প্রকৃত তথ্য ২৪
* শ্রীলঙ্কায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বামপন্থীদের জয় ২৬
* মোদানী সরকার চায় ধনী ব্যবসায়ীদের চূড়ান্ত একাধিপত্য ২৭
* শাসনের মুখ্য ভূমিকায় কি মহামান্য আদালত ৩১
* ভারতে ছাত্র আত্মহত্যার বার্ষিক হারে উদ্বেগজনক বৃদ্ধি ৩৪
* সত্যপ্রিয় ঘোষের জীবন ও সাহিত্য ৩৫
* রাতের ভারতবর্ষ ৩৬
* আহার নিয়ে গল্পগাথা ৩৭
* ৮ বি ৩৯

সম্পাদকীয়

ভাল নেই বঙ্গের শরৎ

এই শরতে একটুও ভাল নেই বাংলা। না পশ্চিমবঙ্গ, না বাংলাদেশ; ভাল নেই কেউ।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে মহিলা পড়ুয়া চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় তোলপাড় হচ্ছে গোটা পশ্চিমবঙ্গ। কেবল পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশ, গোটা বিশ্ব। সমাজমাধ্যম মারফত আমরা তার সবই জানতে পারছি। কিন্তু আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজ অবস্থানে অটল। ওই ধর্ষণ খুনের সঙ্গে জড়িত পুলিশ, হাসপাতালের দুর্নীতিগ্রস্ত চিকিৎসক-আধিকারিকদের বাঁচাতে সুপ্রিম কোর্টে করদাতাদের কোটি কোটি টাকায় আইনজীবী নিয়োগ করেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী ওই ধর্ষণ-খুনের ঘটনাকে 'ছোট ঘটনা' বলে এড়িয়ে যেতে পারেননি এবার। চেপে ধরেছেন জুনিয়র ডাক্তাররা, রাজ্যের আপামর নারী-পুরুষ। কিন্তু তাঁর নিজ বৈশিষ্ট্য মতো 'ম্যান মেড বন্যা'র ধুয়ো তুলে আবার পুজোয় ফেরা আর আনন্দ ফেরার ডাক দিয়ে সাধারণ মানুষের বিশেষত বিপুল সংখ্যায় নারীর অংশগ্রহণে নজিরহীন আন্দোলনের গতিমুখ ভোতা করে দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। পুজোর মধ্যেও তবু আন্দোলন থেমে নেই। এবার সত্যিই এক ব্যতিক্রমী পুজো।

ওদিকে, মাত্র দেড় মাস আগে একটা গণঅভ্যুত্থান হয়ে গেছে বাংলাদেশে। শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে যেখানে সবার কাছে দেশ গড়ার কথা সর্বোচ্চ প্রাধান্য পাবে, সেখানে একের পর এক মাজার ভাঙা হচ্ছে। শুধু মাজার ভাঙা হচ্ছে না, হিন্দু সম্পত্তি লুঠপাট, নারী অপহরণ, মন্দির ভাঙা, মূর্তি ভাঙা চলছে, পাহাড়ে আক্রান্ত হচ্ছে আদিবাসীরা, বিশ্ববিদ্যালয়ে গণপিটুনিতে মানুষ মারা হচ্ছে, যৌনকর্মীদের জনসমক্ষে বেধড়ক পেটানো হচ্ছে। দেশের বেশিরভাগ শিল্প কারখানা বন্ধ, বাজার দরে নিয়ন্ত্রণ নেই; সাধারণ মানুষ আছে কষ্টের মধ্যে। অবস্থাটা বিব্রতকর ও কষ্টদায়ক। বাংলাদেশে কার্যকর কোনও সরকার আছে বলে মনেই হয় না।

শারদীয় উৎসবের মুখে মালদা আর মুর্শিদাবাদে একের পর এক গ্রাম বাড়ি-ঘর কৃষিজমি সমেত গঙ্গায় তলিয়ে যাচ্ছে। এ সমস্যা আজকের নয়; গত প্রায় পঞ্চাশ বছরের, ফরাক্কার ব্যারেজ নির্মাণের পর থেকে। কেন্দ্র বা রাজ্য কোন সরকারই তাদের পাশে দাঁড়ায় না। সমস্যার স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা পর্যন্ত নেই।

এর ভিতরেও মানুষ ভাল থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়। ভাল তো তাকে থাকতেই হবে!

সম্পাদক

শান্তনু দত্তচৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

Scanned with OKEN Scanner

জমিদার রবীন্দ্রনাথ

আহমাদ ইশতিয়াক

রবীন্দ্রনাথ নিষ্ঠুর জমিদার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের সারাজীবন শোষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কখনোই এদেশের কৃষকদের, সাধারণ মানুষের কখনো উন্নতি চাননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বলেছেন, 'মূর্খের দেশে আবার কিসের বিশ্ববিদ্যালয়'। এমন কতো অপবাদ কি অবলীলায় চালানো হয় রবীন্দ্রনাথের নামে। কতো মিথ্যাচার শুনতে হয়।

অথচ শিলাইদহ, শাহজাদপুর বাদ দিলাম এক পতিসরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারীতে যা করেছেন বাংলার ইতিহাসে কোন জমিদার তা করেনি। পারিবারিক সূত্রে পাওয়া জমিদারী দেখাশোনার জন্য ১৮৯১ সালে প্রথম পতিসরে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জমিদারি ভাগ হওয়ায় নওগাঁর কালিগ্রাম পরগণার জমিদারি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তৎকালীন সময়ে কালিগ্রাম পরগণা ছিল নিচু এলাকা। এক ফসলি জমি। একটিমাত্র ধানের আবাদ হয়, তাও বন্যায় ষোলো আনা পাওয়া যায় না। অধিকাংশ প্রজাই দরিদ্র। একবেলা খেতেও পারত না। এসব বিষয়গুলো রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়ে তুলতো। মহাজনী সুদ থেকে প্রজাদের বাঁচাতে রবীন্দ্রনাথ স্বজনদের কাছ থকে টাকা ধার নিয়ে ১৯০৫ সাল থেকে প্রথম 'কৃষি ব্যাংক' চালু করেছিলেন।

মহাজনরা অখুশি হলেও গ্রামে-গ্রামে প্রজাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এই ব্যবস্থা। কৃষকদের বাঁচাতে আরো টাকা প্রয়োজন। নিজের নোবেল পুরস্কারের ১ লাখ ৮ হাজার টাকা কৃষি ব্যাংকে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি এতোটাই নিষ্ঠুর জমিদার ছিলেন ঋণ আদায় করতে না পারায় অর্থ সংকটে পড়ে ব্যাংকটি। এমতাবস্থায় ১৯৩৭ সালে জুডিশিয়াল বোর্ড গঠন করলে ঋণ ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়। তখন প্রজাদের কাছে থাকা ঋণের সব অর্থই আটকে যায়।

১৯১০ সালে পতিসরের কাছারি বাড়ির একটি কক্ষে হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন রবীন্দ্রনার। কিন্তু হোমিও ওষুধ দিয়ে সব রোগের চিকিৎসা হতো না। তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অঞ্চলে প্রথম আধুনিক চিকিৎসা সেবা শুরু করেন।

পরে সার্টিফিকেটধারী চিকিৎসক নিয়োগ দিয়ে প্রজাদের চিকিৎসা সেবা দিতেন। তখন নার্সও নিয়োগ দেয়া হয়। তিন-চারটি বেড রাখা হয়েছিল। এই চিকিৎসাসেবা ১৯২০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।

এলাকার কৃষকদের বাঁচাতে ধর্মগোলা স্থাপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ধর্মগোলা মানে শস্যভান্ডার। যে বছর আবাদ ভালো হতো সে বছর প্রজাদের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য নিয়ে রেখে দেয়া হতো ধর্মগোলায়। যখন আবাদ হতো না তখন সেই গোলা থেকে কৃষকদের মধ্যে দেয়া হতো। আবার আবাদ হলে সে শস্য আবার ধর্ম গোলায় জমা করতেন কৃষকেরা। সে সময় কোনো মহাজনদের কাছ থেকে এক মণ খাদ্য নিলে দেড় গুণ বা দুই গুণ খাদ্য দিতে হতো মহাজনকে। এজন্য দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল এই ধর্মগোলা।

হতদরিদ্র প্রজাদের গাভী পালনে প্রশিক্ষণ ও ধানচাষের বাইরে অন্য পেশায় আয় বাড়াতে তাঁতব্যবস্থা, অন্য ফসলের দিকে যেন মানুষ আকৃষ্ট হয় সে ব্যবস্থাও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ জন্য কয়েকজনকে নিয়ে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকতনেও। সেখানে তাঁদের কৃষি প্রশিক্ষণ দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন পতিসরে। এক ফসলি জমিতে অন্য ফসল চাষ করাতে জমির আইলে খেজুর গাছ, আমগাছ, পেঁপে চাষ শুরু করান তিনি।

এ ছাড়াও বাস্তুভিটাতে ফলের গাছ লাগাতে উদ্বুদ্ধ করতেন। এসময়ে এলাকায় অপ্রচলিত ভুট্টা, আলুর চাষ শুরু করেন। প্রজাদের মহাজনদের সুদের বেড়াজাল থেকে বাঁচাতে ঋণ সালিশী সংস্থা কালিগ্রাম হিতৈষীসভা গঠন করেন রবীন্দ্রনাথ। সে সময় কালিগ্রাম কাছারিবাড়ি থেকে কালিগ্রাম পরগণায় জমিদারির কার্যক্রম পরিচালনা করা হত। কালিগ্রাম পরগণার আওতায় প্রায় ৬শ' গ্রাম ছিল। এই 'হিতৈষীসভা' তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এর মধ্যে কালিগ্রাম হিতৈষীসভা, ভান্ডারগ্রাম হিতৈষীসভা ও পতিসর হিতৈষীসভা। কাছারি বাড়ির আওতায় থাকা প্রতিটি গ্রাম থেকে একজন গ্রাম প্রধান ও কাছারি বাড়ির একজন ও জমিদারের প্রতিনিধি একজন করে পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছিলো।

এই পঞ্চায়েতের কাজ ছিলো গ্রামের সাধারণ মানুষদের বিরোধ মিটিয়ে দেয়া, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, সেতু নির্মাণ করা, পাঠশালা নির্মাণ করা। ম্যালেরিয়া হওয়ায় গ্রামের জঙ্গল কেটে ফেলা ইত্যাদি। রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, সেতু নির্মাণ, পাঠশালা নির্মাণ, গ্রামের জঙ্গল কেটে ফেলতে তো টাকা লাগবে। কিন্তু সে টাকা কোথা থেকে আসবে? তখন সিদ্ধান্ত হলো রবীন্দ্রনাথ অর্ধেক টাকা দিবেন, আর বাকি অর্ধেক টাকা হিতৈষীসভা দিবে।

এভাবে কয়েক বছরের মধ্যে তখন ১১ হাজার টাকা সংগ্রহ হয়েছিল। এরপর শুরু হয় রাস্তাঘাট নির্মাণ, পাঠশালা নির্মাণ। ৬শ' গ্রামের মধ্যে প্রায় ২০০টি গ্রামে পাঠশালা নির্মাণ করে পাঠদান শুরু হয়। এই পাঠশালার মাস্টারদের বেতন ও দিতেন রবীন্দ্রনাথ। একইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তিনটি মাইনর স্কুল চালু করেন। একটি পতিসরে, অপর দুটি রাতোয়াল ও ভান্ডারগ্রামে।

নিজের প্রজাদের জন্যে চাষ ব্যবস্থায় উন্নয়ন ঘটানো জন্যে ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ নিজের ছেলে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শিরিষ চন্দ্র মজুমদারের ছেলে সন্তোষ চন্দ্র মজুমদারকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষির উপর পড়াশুনার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। অথচ তিনি চাইলেই ইঞ্জিনিয়ারিং বা অন্য কিছু

Scanned with OKEN Scanner

পড়াতে পারতেন!

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার যখন কৃষির উপর পড়তে আমেরিকা গেলেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের চিঠিতে লিখেছিলেন; 'তোমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজার অন্ন গ্রাসের অংশ নিয়ে বিদেশে কৃষি শিখতে গেছ। ফিরে এসে এই হতভাগ্যদের অন্ন গ্রাস কিছু পরিমাণেও যদি বাড়িয়ে দিতে পার তাহলে মনে সান্ত্বনা পাব। মনে রেখো, জমিদারের টাকা চাষির টাকা এবং এই চাষিরাই তোমাদের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজেরা আধপেটা খেয়ে এবং না খেয়ে বহণ করছে। এদের ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করবার দায় তোমাদের উপর রইল। নিজেদের সংসারিক উন্নতির চেয়েও এইটেই তোমাদের প্রথম কর্তব্য হবে।'

১৯০৯ সালে পড়াশোনা শেষে দেশে ফিরে এলেন রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষ মজুমদার। কলকাতায় বা পশ্চিমবঙ্গে না রেখে নিজের ছেলেকে পতিসরে নিয়ে এলে রবীন্দ্রনাথ। তখন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলের লাঙ্গলে চাষ করে আধুনিক পদ্ধতি শিখিয়েছেন প্রজাদের। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য পতিসরে ৭টি বিদেশি কলের লাঙল এনেছিলেন কলকাতা থেকে। সঙ্গে আনিয়ে ছিলেন বিদেশি ইঞ্জিনিয়ার। আধুনিক চাষাবাদ, আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, খামার ব্যবস্থাপনা, হস্ত ও কুটিরশিল্প, তাঁতশিল্প, রেশমশিল্পের বিকাশ ঘটানো ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য রবীন্দ্রনাথ পতিসরে যা করেছিলেন তাতে পতিসর কয়েক বছরের মধ্যে প্রায় দারিদ্র শূন্য হয়ে গিয়েছিলো। পতিসরকে মডেল হিসেবে তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ; 'তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক-একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ করো। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহারসাামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত করো।'

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতৃ স্মৃতি গ্রন্থে বাবা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি তুলে এনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই চিঠিতে ছেলেকে লিখেছিলেন, 'পতিসরে পৌঁছে গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি দেখে মন পুলকিত হয়ে উঠলো। পতিসরের হাইস্কুলে ছাত্র আর ধরছে না। দেখলুম ; নৌকার পর নৌকা নাবিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ছেলের দল স্কুলের ঘাটে। এমনকি, আট-দশ মাইল দূরের গ্রাম থেকেও ছাত্র আসছে। পড়াশুনার ব্যবস্থা প্রথম শ্রেণীর কোন ইস্কুলের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। পাঠশালা, মাইনর স্কুল সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। হাসপাতাল ও ডিস্পেনসারিতে কাজ ভালো চলছে। যে সব জোলা আগে এক সময় গামছা বুনতো তাঁরা এখন ধুতি, শাড়ী, বিছানার চাদর বুনতে পারছে। কুমোরদেরও কাজের উন্নতি হয়েছে। গ্রামবাসীর আর্থিক দুরবস্থা আর নেই। শুধু চাষীরা অনুযোগ জানালো তাদেরকে চাষের জন্য আরও ট্রাক্টর এনে দেওয়ার জন্য।'

রবীন্দ্রনাথ ১৯১১ সালের উইলে নিজের স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি দান করেছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথকে। এক চিঠিতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'জমিদারি সম্পত্তির আয় নিজের ভোগে না লাগাইয়া প্রজাদের হিতার্থে যাহাতে নিযুক্ত করেন রথীকে সে সম্বন্ধে বার-বার উপদেশ দিয়াছি। তদনুসারে এইরূপ মঙ্গল অনুষ্ঠানে সে যদি তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি প্রসন্নচিত্তে উৎসর্গ করিতে পারে তবে আমার বহুকালের একান্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়..'

পতিসরের জমিদারী ছেড়ে দিলেও রবীন্দ্রনাথ পতিসরকে কিংবা পরিসরের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে কখনোই ভুলতে পারেনি। তাইতো প্রজাদের প্রবল অনুরোধে মৃত্যুর চার বছর আগে ১৯৩৭ সালের ২৭ জুলাই শেষবারের মতো পতিসরে এসেছিলেন কথিত নিষ্ঠুর ও বর্বর জমিদার রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমান

শুভ বসু

নবাব নাজিম মুর্শিদ কুলি খাঁর সময়ে বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়। সেই সময়ে উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের আরো অনেক প্রতিনিধিরা বাংলার রাজস্ব সংগ্রাহক বা জমিদার হিসাবে নিযুক্ত হন। এঁদের মধ্যে সর্ববৃহৎ ছিলেন বর্ধমান, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, নদিয়া, দিনাজপুর এবং নাটোরের মহারাজারা। মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নবাব নাজিম অনেক বেশি নিরাপদ মনে করতেন এবং তাঁদের সেই কারণে ক্ষমতা দিয়েছিলেন রাজস্ব সংগ্রহের। কোম্পানির আমলে ১৭৫৭ থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের গন্ডগোল, দুর্ভিক্ষ এবং একই সময়ে ইংরেজদের উত্তর আমেরিকার উপনিবেশ হারানোর ফলে ব্রিটিশ সরকার কোম্পানি রাজত্বের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন এবং লর্ড কর্নওয়ালিস যিনি আমেরিকার ইয়র্ক টাউনের যুদ্ধে পরাজিত হন তাঁকে ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করেন এবং তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করেন। যার ফলে রাজস্ব সংগ্রাহক জমিদাররা পরিণত হন মধ্যস্বত্বভোগী পরগাছা ভূস্বামী শ্রেণীতে। সেই সঙ্গে যেহেতু অধিকাংশ জমিদার হিন্দু ছিলেন তাঁরা পরিণত হন বাংলার এই নয়া সামন্তবাদী ব্যবস্থার শরিকে। পূর্ব বাংলার কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন মুসলমান। তাঁরা পরিণত হন প্রজা সমাজে। এই জমিদার প্রজার দ্বন্দ্ব বাংলার সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান এবং দলিতদের মধ্যেকার সম্পর্কের নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায়। আবার কলকাতার মধ্যে ইংরেজদের দালাল বা মধ্যস্থতা কারী গোমস্তা হিন্দু ব্যবসায়ী শ্রেণী প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ১৮৪৮ সালে কলকাতার ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কলকাতার হিন্দু ব্যবসায়ী মহলের বহু অংশ আবার জমিদারিতে বিনিয়োগ করেন। তাঁদের মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের

Scanned with OKEN Scanner

দ্বারকানাথ ঠাকুর অন্যতম। তিনি ব্যবসায়ী থেকে জমিদার-এ রূপান্তরিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ বাঙালি হিন্দু জমিদার শ্রেণী ইংরেজ শাসকদের দয়াতে বাংলায় তাদের মোরসিপাট্টা গেড়ে বসেন।(সূত্র ব্লেয়ার বি কিং Partner in Empire Dwarkanath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India; Berkeley University of California Press ,১৯৭৬)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ইংরেজ শাসনের সহযোগী নতুন উদীয়মান কলকাতার বাবুসমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি জীবন জিজ্ঞাসার অনুসন্ধান শুরু করেন। সেই সঙ্গে তাঁরা ধীরে ধীরে আরবি ফারসি অধ্যয়ন থেকে ইংরেজি অধ্যয়ন শুরু করেন। সেই অর্থে রামমোহন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন শেষ ফার্সি ভাষায় পন্ডিত হিন্দুদের মধ্যে। সেই সঙ্গে কলকাতায় স্থাপিত ইংরেজ আমলাদের শিক্ষার জন্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এ বাংলাভাষার চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় নতুন বাংলা গদ্যের। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রামরাম বসু প্রমুখের কল্যানে বাংলাভাষা হয়ে ওঠে ফার্সি বর্জিত তৎসম বহুল একটি গদ্য। ভারতের ইতিহাস রচনায় ইংরেজদের জ্ঞানভাষ্য বহুলাংশে গ্রহণ করেন নব্য বাবু সমাজের বুদ্ধিজীবীরা। ফলে টড, গ্রান্ট, ডাফ এলফিনস্টোন এবং হেনরি মিয়ার্স এলিয়ট এবং সর্বোপরি জেমস মিল এর ইতিহাস পড়ে তাঁদের মধ্যে দিল্লির সুলতানি এবং মুঘল শাসনের প্রতি জেগে ওঠে বিবমিষা। আর অন্যদিকে বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজ পরিণত হন নীরব সংখ্যাগুরু তে যা প্রায় অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতাবাদ বলা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নতুন জাতীয়তাবাদ এর উত্থান মূলত হিন্দু জাতীয়তবাদী বলা যায়। বাঙালি হিন্দু লেখকরা বাংলার প্রাক ঔপনিবেশিক যুগের লেখক সৈয়দ সুলতান থেকে আলাওল পর্যন্ত লেখকদের কথা ভুলে গেলেন। যে ভাষায় রচিত হয়েছিলো সেই অপূর্ব কাব্য

প্রথমে প্রণমি প্রভু অনাদি নিধান
নিমিষে সৃজিছে যেই এ চৌদ্দ ভুবন।
আদি অন্ত নাহি তার নাহি স্থান স্থিত।
খন্ডন বর্জিত রূপ সর্বত্রে ব্যাপিত। [নবী বংশ]

সেই বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস কলকাতার নব্যবাবুসমাজ বিস্মৃত হয়েছিলেন। আবার এই নতুন বাবুসমাজের লেখকদের মধ্যে মুসলমান বিদ্বেষ স্পষ্ট ছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ এবং ফার্সি পন্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র কালী প্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি বহু মনীষী এই ধারণা পোষণ করতেন। এমন কি প্রখ্যাত অর্থিনীতিবিদ রমেশ চন্দ্র দত্ত মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত উপন্যাস রচনা করেন। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর থেকে মাত্র একশত বৎসর আগে গঙ্গারাম বসু মহারাষ্ট্রপুরাণে পশ্চিমবাংলার হিন্দু সমাজের উপর বর্গীদের হাঙ্গামার কি তীব্র অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত যে বাংলার ক্ষেত্রে শুভ সূচনা করে নি সে কথা ডাফ এর রচিত ইতিহাস পড়ে তাঁরা ভুলে যান। ঋষি বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদ ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। কলকাতার উদ্ভিন্ন জাতীয় মেলা ছিল একদিকে যেমন ভারতবর্ষীয় মেলা অন্য দিকে হিন্দু মেলা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তরুণ সৃষ্টিশীল যুবক রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মেলার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ১৮৯৬ সালে মহারাষ্ট্রের প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী বাল গঙ্গাধর তিলক শিবাজী উৎসব চালু করলে কলকাতায় তার প্রভাব পড়েছিল বই কি। রবীন্দ্রনাথের শিবাজী উৎসব কবিতাটিতে তার প্রভাব দেখা যায়। তবে কি রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের হিন্দু ভাবধারাতে আত্ম নিমগ্ন ছিলেন। কিন্তু সেই কথা বললে রবীন্দ্রনাথের সেই সময়কার লেখার প্রতি অবমাননা করা হবে।

রবীন্দ্রথের প্রথম মুসলমান সমাজ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ লেখা হলো ১৮৮৫ সালে। তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের নাম ' আকবর শাহের উদারতা।' তিনি লিখেছিলেন 'আকবর শাহের মাতৃ ভক্তি প্রবল ছিল। এমন কি এক সময়ে যখন তাঁহার মা পালকি চড়িয়া লাহোর হইতে আগেই যাইতেছিলেন, তখন আকবর এবং তাহার দেখাদেখি অন্যান্য বড় বড় ওমরাওগণ নিজের কাঁধে পালকি লইয়া তাঁহাকে নদী পার করিয়াছিলেন। সম্রাটের মা সম্রাট কে যাহা বলিতেন তিনি তাহাই পালন করিতেন। কেবল আকবর শা মায়ের একটি আজ্ঞা পালন করেন নাই। সম্রাটের মা খবর পাইয়াছিলেন যে পর্তুগিজ নাবিকগণ একটি মুসলমান জাহাজ লুঠ করিয়া এক খন্ড কোরান গ্রন্থ পাইয়াছিল , তাহারা সেই গ্রন্থ একটি কুকুরের গলায় বাঁধিয়া বাজনা বাজাইয়া অমর্য শহর প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। সেই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট মাতা আকবর কে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে এক খন্ড বাইবেল গাধার গলায় বাঁধিয়া আগ্রা শহর ঘোরানো হউক। সম্রাট তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে কার্য্য একদল পর্তুগালবাসীর পক্ষেই নিন্দনীয় সে কার্য্য একজন সম্রাটের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত সন্দেহ নাই। কোনো ধর্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিলে ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়। অতএব আমি একখানা নিরীহ গ্রন্থের উপর দিয়া প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করিতে পারিব না।'

প্রবন্ধটি 'বালক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাহ ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত। সেই বৎসরেই রবীন্দ্রনাথ প্রত্রিকাটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কালে সরাসরি মুসলমান সমাজ নিয়ে , ইতিহাস নিয়ে অনেক গুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন, শিখ স্বাধীনতা , প্রাচ্য সমাজ, দালিয়া বলে একটি বড় গল্প রচনা করেন শাহ সুজার কন্যা কে নিয়ে। ১৮৯২ সালে সাধনা পত্রিকাতে তিনি ' কাবুলিওয়ালা ' গল্প প্রকাশ করেন। সেই উপলক্ষে লেখেন মিনি তার বড় মেয়ের আদলে রচিত। কাবুলিওয়ালা গল্পের কাহিনী সুপরিচিত। ১৯৫৭ সালে রূপকার নাট্যগোষ্ঠী কাবুলিওয়ালা কাহিনী মঞ্চস্থ করেন তুলসি লাহিড়ীর পরিচালনায়। সেই বছরে তপন সিংহ

Scanned with OKEN Scanner

কাবুলিওয়ালা ছায়াছবি পরিচালনা করেন। তার চার বছর পরে হিন্দিতেও কাবুলিওয়ালা অভিনীত হয়। আফগানিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আশরাফ গনি ২০১৫ সালে ভারত সফরে এসে বলেছিলেন 'May I take a moment to thank Rabindranath Tagore. Kabuliwalay has done more to give us a brand which we could not buy with a billion dollars of advertisements.' আমি নিজে ফিলাডেলফিয়াতে এশিয়ান স্টাডিস কনফারেন্স এ আফগান তরুণ তরুণীদের রবীন্দ্রনাথ এবং কাবুলি ওয়ালা নিয়ে উৎসাহ দেখেছি। হিজাব পরিহিতা আফগান তরুণী আমাকে আলহামদুল্লিলা বলে জড়িয়ে ধরেছিলেন আমি শান্তিনিকেতনের ছেলে বলাতে। তাঁর স্বামীও সেই একই আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছিলেন। তাগোরে আর তাঁর শিষ্য সৈয়দ মুজতবা আলী শান্তিনিকেতন কে প্রখ্যাত করে গেছেন আফগানদের কাছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই সময়ে আর একটি উল্লেখিত ঘটনা হলো আকুল সরকারের বিবাহ। ১৮৯০ সালের জানুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাবনা জেলার সাজাদপুরে জমিদারীর কাজে গিয়ে আকুল সরকার বলে এক মুসলমান যুবকের হিন্দু মেয়ে লতা ভদ্রের সঙ্গে বিয়ে কে কেন্দ্র করে উত্তেজনার অবসান করেন এবং তাঁর মধ্যস্থতাতে তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। তরুণ ইংরেজ জেলা শাসক এফ ও বেল এই ঘটনার একটি তদন্ত করতে যান সাজাদপুর। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় আকুল সরকার কে একটি চিঠিতে লেখেন;

"প্রিয় আকুল সরকার,

তোমার ব্যাকুলতা আমি উপলব্ধি করেছি, সিরাজগঞ্জ থেকে সাহেব এসেছিলেন, আমি তাঁকে তোমাদের বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছি, তুমি নিজের স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করো নি, এই আমার ভালো লেগেছে। সাম্প্রদায়িকতাকে আমি ঘৃণা করি, মানুষের নিকট মানুষের মর্যাদা বাড়া আর কিছু নেই। নারী ও পুরুষের প্রেম এই শাসন মেনে চলে - সে হৃদয়ের বশ, ধর্মের বা বর্ণের অনুশাসন তার বড় নয়, সমাজ প্রাচীর গড়ে কিন্তু হৃদয় সে প্রাচীর অতিক্রম করতে পারে। তোমাদের সাথে আলাপ করে আমি তেমনি দুটো হৃদয়ের সন্ধান পেয়েছি। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শাসন কে নিজের হাতে নিবাসের চেষ্টা করবে না। আশা করি তোমাদের উপরে যে অত্যাচারের আশংকা করা গিয়েছিলো তা দূরীভূত হয়েছে। তোমরা আমার সাহায্য ও সহানুভূতি সর্বদাই লাভ করবে। সুখী হও। সাজাদপুর ২৭ শে জানুয়ারি ১৮৯০।"

যে যুগে হিন্দুরা মুসলমানদের খাবারে দৃষ্টি পড়লে সেই খাবার ফেলে দিতেন, সে যুগে প্রেমের কবি মুসলমান হিন্দুর বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। আজকের যুগে ভারতের কিছু রাজনীতিবিদ 'লাভজেহাদ' প্রভৃতি তত্ত্বর আমদানি করেন। তবে রবীন্দ্রনাথের উপরে প্রবন্ধে এই একান্ত ক্ষুদ্র মনের মানুষদের কথা বলে নিজেকে ছোট করবো না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ কি ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার বাবুসমাজের হিন্দুয়ানী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না? তাঁর সেই প্রসঙ্গে ১৮৯৫ সালে লিখিত একটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করি। প্রবন্ধটির নাম ' হিন্দু ও মুসলমান'। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ;

"আমাদের একটা মস্ত কাজ আছে হিন্দু-মুসলমান সখ্যবন্ধন দৃঢ় করা। অন্য দেশের কথা জানি না কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমানের সৌহার্দ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাংলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশি এবং হিন্দু মুসলমান প্রতিবেশীসম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ট। কিন্তু আজকাল এই সম্বন্ধ ক্রমশ শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালি মুসলমান বলিতেছিলেন বাল্যকালে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ পরিবারের সহিত নিতান্ত আত্মীয়ভাবে মেশামেশি করিতেন। তাঁহাদের মা মাসিগণ ঠাকুরানিদের কোলে পিঠে মানুষ হইয়াছেন। কিন্তু আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন হিন্দুয়ানি অকস্মাৎ নারদের ঢেকি অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা নবপার্জিত আর্য্য অভিমান কে শজারুর শলাকার মতো আপনাদের চারিদিকে কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছেন কাহারো কাছে ঘেঁসিবার জো নাই। হঠাৎ বাবুর বাবুয়ানার মতো তাঁহাদের হিঁদুয়ানি অত্যন্ত অস্বাভাবিক উগ্রভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। উপন্যাসে নাটকে কাগজে পত্রে অকারণে বিধর্মীদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়া থাকে। আজকাল অনেক মুসলমানও বাংলা শিখিতেছেন এবং বাংলা লিখিতেছেন- সুতরাং স্বভাবতই এক পক্ষ হইতে ইট এবং অপরপক্ষ হইতে পাটকেল বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে , কোথায় তুর্কির সুলতান তিনশত পাচক রাখিয়াছেন ইহা লইয়াই ম্লেছদিগকে তিরস্কার এবং হিঁদুয়ানির বড়াই করিয়া আপন পাড়ার প্রতিবেশীদের সহিত বিরোধের সূত্রপাত করিলে তাহাতে হিন্দুদের মাহাত্ম্য নহে ক্ষুদ্রতার পরিচয় দেওয়া হয়।"

সাধনা পত্রিকাতে চৈত্র মাসের প্রথম সংখ্যাতে প্রকাশিত হয় এই ছোট নিবন্ধটি। কিন্তু এই কণ্ঠস্বর কি হিন্দু সাম্প্রদায়িকের? ভারতে ঔপনিবেশিক যুগে এবং স্বাধীন ভারতে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের বিতর্কের মূলে হলো ইতিহাস চর্চা। ইতিহাস রচনায় ঔপনিবেশিক চিন্তায় হিন্দু সমাজ এবং মুসলমান সমাজকে দুটি পৃথক, সার্বিক ভাবে বিচ্ছিন্ন একান্ত ভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে দেখানো হয়েছিল (হোমোজেনাস এন্ড মনোলিথিক)। ভারতের ইতিহাসের পর্ব বিভাগকে ধর্মীয় বিভাজন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। মুসলমান শাসন কে ইংরেজরা চিহ্নিত করেছিলেন এক নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ধর্মান্ধ যুগ হিসাবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ইংরেজদের প্রাচ্য তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু তিনি আবার ঔপনিবেশিক ইতিহাস চিন্তার থেকে মুক্তি খুঁজছিলেন, কিছুটা পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন, কিন্তু তার ইতিহাস চিন্তার মধ্যে অভিনবত্ব ছিল।

Scanned with OKEN Scanner

আবার নানাধরনের সে যুগের ইতিহাস রচনার সীমাবদ্ধতার ছায়া ছিল।

ইতিহাস বিষয়ে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা ছিল ১৮৮৫ সালে শিখ স্বাধীনতা প্রশ্নে। বলা বাহুল্য অধুনা ভারতের শিখরা তাঁদের শিখদের জীবনে তিনটে কেয়ামতের যুগ চিহ্নিতও করেন প্রথম টি আহমেদ শাহ আব্দালির সময় অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দির ভাঙা, দ্বিতীয়টি ভারত তথা পাঞ্জাব ভাগ এবং তৃতীয়টি ইন্দিরা গান্ধীর অমৃতসরের মন্দির আক্রমণ এবং তাঁর হত্যার পরে দিল্লিতে কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকদের দ্বারা শিখ নিধন যজ্ঞ। এর মধ্যে দ্বিতীয় দুটি ঘটনা রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসানের পরে ঘটে। কিন্তু প্রথম ঘটনার বিবরণে রবীন্দ্রনাথ যেমন শিখেদের উপর অত্যাচারের বর্ণনা করেছেন এবং শিখদের দ্বারা আফগান মুসলমানদের উপর অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন এক নৈবক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

ইতিহাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটু রোমান্টিক বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল নিখিল রায়ের ফটোগ্রাফের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদের ইতিহাস বইয়ের সমালোচনায়। ১৮৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথ লেখেন; "নিখিল বাবুর মুর্শিদাবাদ কাহিনী পড়িতে পড়িতে মনে হয়, এই নূতন কর্মকোলাহলময় মহিমা মরিচীকাবৎ নিঃশব্দে অন্তর্হিত, তাহাতে পাটের কলের সমস্ত বাঁশি নীরব, কেবল চতুর্দিকে মুসমানদের পরিত্যক্ত পুরীর প্রকান্ড ভগ্নাবশেষ নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া। নিঃশব্দ নহবতখানা, হস্তীহীন হস্তীশালা, প্রভুশূন্য রাজ্ তক্ত, প্রজশূন্য আম দরবার, নির্বাণদ্বীপ বেগম মহল একটি পরম বিষাদময় বৈরাগ্যময় মহত্ত্বে বিরাজ করিতেছে। মুসলমান রাজলক্ষ্মী যেন শতাধিক বৎসর পরে তাহার সেই অনাথপুরীর মধ্যে গোপনে প্রবেশ করিয়া একে একে তাহার পূর্বপরিচিত কীর্তিমালার ভগ্ন চিহ্নসকল অনুসরণ করিয়া সনিস্বাসে দূরস্মৃতি আলোচনায় নিরত হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথের এই রোমান্টিক উচ্ছাস বাংলার নবাবদের নিয়ে কি শুধু কবি কল্পনার এককালীন বহিঃপ্রকাশ। আমার তা মনে হয় না। অক্ষয় চন্দ্র মৈত্রের সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থের সমালোচনায় তিনি ইতিহাস নিয়ে আরো প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেছেন। মোগল পাঠানের সময় প্রত্যেক সম্রাট স্বতন্ত্র প্রভুরূপে স্বেচ্ছামতে রাজ্যশাসন করিতেন, সুতরাং তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছার আন্দোলনে ভারত ইতিবৃত্তে পদে পদে রসবৈচিত্র তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজের ভারতবর্ষে ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্রের শাসন। তাহার মধ্যে হৃদয়ের লীলা অত্যন্ত গৌণ ব্যাপার। মানুষ নাই, রাজা নাই, কেবল একটা পলিসি দীর্ঘ পথ ডাক বসাইয়া চলিয়াছে, প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর তাহার বাহক বদল হয় মাত্র।

পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক শাসনের এত সুন্দর সমালোচনা আর নেই। রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন এক হৃদয় হীন নৈবক্তিক পুঁজির শাসনের যার মধ্যে সবই একটি পলিসি মাত্র। ভারত কে সভ্য করার একটি যন্ত্র ঔপনিবেশিক শাসন যার অস্ত্র আধুনিকীকরণ এবং civilizing mission। রবীন্দ্রনাথ আবার কিন্তু সিরাজের প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি লিখছেন; "সিরাজদ্দৌলা যদিচ উন্নত মহৎ চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন না, তথাপি এই দ্বন্দ্বের হীনতা-মিথ্যাচার প্রতারণার উপরে তাঁহার সাহস ও সরলতা, বীর্য্য, ও ক্ষমা রাজোচিত মহত্ত্বে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে।"

এযুগের ভারতে সিরাজের চরিত্রের উপর আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য। কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্য ছিল ঔপনিবেশিক ইতিহাস চিন্তার প্রতি।

অক্ষয় মৈত্রর সিরাজদ্দৌলা সমালোচনাতে তিনি বলেন; "ঘাত-প্রতিঘাতের একটা স্বাভাবিক নিয়ম আছে। প্রাচ্য চরিত্র, প্রাচ্য শাসন নীতি সম্বন্ধে ইংরেজি গ্রন্থে ছোট-বড়, স্পষ্ট অস্পষ্ট, সঙ্গত অসঙ্গত অজস্র কটূক্তি পাঠ করিয়া শিক্ষিত সাধারণের মনে যে একটা অবমাননাজনিত ক্ষোভ জন্মাতে পারে এ কথা অল্প ইংরাজই কল্পনা করেন।

অথচ প্রথম শিক্ষাকালে ইংরাজের গ্রন্থ আমরা বেদবাক্যস্বরূপ গ্রহণ করিতাম। তাহা আমাদের যতই ব্যথিত করুক তাহার প্রতিবাদ সম্ভবপর, তাহার যে প্রমান আলোচনা আমাদের আয়ত্তগত এ কথা আমাদের বিশ্বাস হইত না। নীরবে নত শিরে আপনাদের প্রতি ধিক্কার সহকারে সমস্ত লাঞ্ছনা কে সত্যজ্ঞানে বহন করিতে হইত।

এমত অবস্থায় আমাদের দেশের যেকোন কৃতি গুণী ক্ষমতাশালী লেখক সেই মানসিক বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, যিনি আমাদিগকে অন্ধ অনুবৃত্তি হইতে মুক্তিলাভের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিয়াছেন তিনি আমাদের দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাপাত্র। তাহা ছাড়া প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংঘর্ষে আমাদের ভাগে যে কেবলি কলঙ্ক সেটা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা এবং বিরুদ্ধ প্রমান আনয়ন করা আমাদের নতশির ক্ষতহৃদয়ের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক ইতিহাস চিন্তার থেকে একটি মুক্তির পথ খুঁজছেন। তিনি মনে করছেন ঔপনিবেশিক চিন্তাই ভারতের অভ্যন্তরে হিন্দু মুসলমান বিরোধের কারণ। সেই প্রসঙ্গে তিনি শ্রী গোপাল চন্দ্র শাস্ত্রীর লেখা 'সহরত-এ আম' প্রবন্ধের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখছেন যে মুসলমান রাজত্বে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট ছিল তাতে প্রজাদের জন্যে কৃষি কার্য্য এবং জলের সুবিধা, ডাকখানার বন্দোবস্ত ছিল, ত্বরিৎ গতিতে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রেরণ এবং সমাচারপত্র প্রকাশ। মুসলমান তথা এশিয়া রাজত্বের সঙ্গে ব্রিটিশ রাজত্বের তুলনা করে রবীন্দ্রনাথের কাছে মনে হয়েছিল 'ইংরাজরাজ্যের সুশাসন ও সুব্যবস্থা যে আমাদের কাছে কলের বোধ হয় , তাহা যে অনেক সময় আমাদের কল্পনা এবং হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না তাহার কারণ ইংরাজ -রাজকার্য্যে রাজোচিত প্রত্যক্ষ ঔদার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজত্ব যেন একটি বৃহৎ দোকান সওয়াদাগরের 'একচেটে'

Scanned with OKEN Scanner

রাজকার্য নামক মালগুলি প্রজাদের অগত্যা কিনিতে হয়।'

রবীন্দ্রনাথ মধ্যে পুঁজিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে একটি অব্যক্ত ক্ষোভ ছিল যেটা তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে নীতিবোধের শাসনের সঙ্গে বাজার অর্থনীতির শাসনের তুলনা করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা কি ছিল? ১৮৯৮ সালে আব্দুল করিম সাহেবের মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস সংক্রান্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা লিখছেন তাতে এক প্রাচ্যতত্ত্বের ছায়া পাওয়া যায়। সেখানে তিনি লিখেছেন; 'ভারতবর্ষের প্রতিবেশে বহুতর খন্ডবিচ্ছিন্ন জাতি মহাপুরুষ মোহাম্মদের প্রচন্ড আকর্ষণ বলে একীভূত হইয়া মুসলমান নামক এক বিরাট কলেবর ধারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল। তাহারা যেন ভিন্ন ভিন্ন দূর্গম মরুময় গিরিশিখরের উপরে খন্ড তুষারের ন্যায় নিজের নিকটে অপ্রবুদ্ধ এবং বাহিরের নিকটে অজ্ঞাত হইয়া বিরাজ করিতেছিল। কখন প্রসঙ্গ সূর্য্যের উদয় হইলো এবং দেখিতে দেখিতে নানা শিখর ছুটিয়া আসিয়া তুষারস্রুত বন্যা একবার একত্র স্ফীত হইয়া তাহার পরে উন্মত্ত সহস্র ধারায় জগৎ কে চারদিকে আক্রমণ করিতে বাহির হইলো।

রবীন্দ্রনাথ এখানে মুসলমান সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে তলোয়ারের জোরের যুক্ত করেছেন এবং ভারতকে নিরীহ শান্ত ধ্যানমগ্ন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে কি রবীন্দ্রনাথ মুসলমান শাসন কে বিদেশী বলে মনে করতেন। তিনি আবার যেন নিজে কে খণ্ডন করে নকলের নাকাল প্রসঙ্গে ১৩০৮ (১৯০১) সালে তাঁর দ্বারা পুনরুজ্জীবিত বঙ্গ দর্শন পত্রিকায় আষাঢ় সংখ্যায় লিখছেন; 'মুসলমান রাজত্ব ভারতবর্ষেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাহিরে তাহার মূল ছিল না। এইজন্য মুসলমান ও হিন্দু সভ্যতা পরস্পর জড়িত ছিল ।পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক আদান প্রদানের সহস্র পথ ছিল। এই জন্যে মুসলমানের সংশ্রবে আমাদের সংগীত সাহিত্য শিল্পকলা, বেশভূষা, আচার ব্যবহার, দুই পক্ষের যোগে নির্মিত হইয়া উঠিতেছিল। উর্দু ভাষার ব্যাকরণ গত ভিত্তি ভারতবর্ষীয়, তাহার অভিধান বহুলপরিমানে পারসিক এবং আরবি। আধুনিক হিন্দুসংগীতও এইরূপ। অন্য সমস্ত শিল্পকলা হিন্দু ও মুসলমান কারিগরের রুচি ও নৈপুণ্যে রচিত। চাপকান জাতীয় সাজ যে মুসলমানের অনুকরণ তাহা নহে, তাহা উর্দুভাষার ন্যায় হিন্দু মুসলমানের মিশ্রিত সাজ; তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন আকারে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

আস্তে আস্তে বিংশশতাব্দীর গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভারতের ইতিহাস সম্পর্কিত নিজস্ব ধারায় ভারতকে এক অভিনব রসায়ানাগার হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ধীরে ধীরে তিনি ভারতের ইতিহাস প্রসঙ্গে একটি ধারণাই উপনীত হচ্ছেন। সেই কথাই তিনি পূর্ব পশ্চিম প্রবন্ধে বলেছেন যা প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসী পত্রিকাতে ভাদ্র সংখ্যা ১৩১৫ সালে (১৯০৮)। সেই কথা দিয়ে আমি এই পর্ব শেষ করি। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন; 'ভারতবর্ষেও যে ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে এ ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য্য এ নয় যে, এ দেশে হিন্দুই বড় হইবে বা আর কেহ বড় হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে - ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। এই পরিপূর্ণতার প্রতিমা গঠনে হিন্দু, মুসলমান বা ইংরেজ যদি নিজের বর্তমান বিশেষ আকারটিকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে স্বজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের অপচয় হয় না।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চিন্তার মানবিক দিক এই সময়ের পর থেকে ক্রমাগত বেড়ে গেছে। তিনি ভারতবর্ষের রূপকে ক্ষুদ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের থেকে উর্ধ্বে একটি সামগ্রিক মানবিক রূপে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল উপনিবেশিক চিন্তার থেকে, সাম্প্রদায়িক বিভাজন থেকে মুক্তির উপায় এটাই। কোনো খণ্ডিত সামাজিক স্বত্ত্ব নয় পূর্ণ মানবিক সত্ত্বার অনুসন্ধান ছিল তাঁর ইতিহাস চিন্তার ধারক।

পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে

নারায়ণ দেব

২৬শে সেপ্টেম্বর বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের পুণ্য আবির্ভাব দিবস। সেই উপলক্ষে তাঁর বিচিত্র কর্মমুখর জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের উল্লেখ পূর্বক সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনার উপস্থাপন করা হচ্ছে।

বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারমূলক সংক্ষিপ্ত কার্যসমূহ ঃ বিধবা- বিবাহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দান। বিধবা বিবাহের সপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপন করে ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ। হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ কর্তৃক বিধবা বিবাহের তীব্র বিরোধিতা।প্রতিবাদীদের প্রত্যুত্তর দানের জন্য ১৮৫৫ র অক্টোবর মাসে উপরোক্ত শিরোনামে দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ। বিধবা বিবাহ আইন পাসের জন্য ভারতের তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের নিকট তৎকর্তৃক একটি আবেদন পত্র পেশ (১৮৫৫)। রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে বিরোধী পক্ষ থেকেও সরকারের কাছে বিপরীত আবেদন পত্র দাখিল (১৭ই মার্চ, ১৮৫৬)। বহুবিধ বিচার বিশ্লেষণের পর সরকারের ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক বিধবা বিবাহ আইনের খসড়া গ্রহণ এবং ২৬শে জুলাই, ১৮৫৬ গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে এটি আইনে পরিণত। আইন অনুযায়ী প্রথম বিধবা বিবাহ করেন (৭ই

ডিসেম্বর, ১৮৫৬) অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। এই বিবাহ ছাড়াও অতঃপর বিভিন্ন স্থানে ঈশ্বরচন্দ্রের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে বহু বিধবা বিবাহ নিষ্পন্ন। ৬০টি বিধবা বিবাহ দিতে গিয়ে তাঁর প্রায় ৮২০০০ টাকা ব্যয় হয়েছিল এবং তাঁকে আকণ্ঠ ঋণভারে জর্জরিত হতে হয়েছিল। ১৮৭০ সালে তাঁর পুত্র নারায়ণ চন্দ্র স্বেচ্ছায় এক বালবিধবার পাণিগ্রহণ করলে তাঁর ব্রতের সার্থকতালাভ।

বিদ্যাসাগর ছিলেন 'করুণাসাগর'। তাই চোখের সামনে বাঙালি সমাজে বালবিধবাদের দুরবস্থা তাঁকে বিচলিত করেছিল। এই কারণে বিধবা বিবাহের জন্য 'সর্বস্বান্ত' হতে, এমনকি 'প্রাণান্ত' স্বীকারেও কখনো পরাঙ্মুখ হন নি। বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে দীর্ঘ কাল সংগ্রাম পরিচালনা। এ প্রথার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপন করে ১৮৭১ সালে জুলাই মাসে বিদ্যাসাগর 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' শীর্ষক প্রথম পুস্তিকা এবং বহু বিবাহ সমর্থনকারীদের মত খণ্ডন করে ১৮৭৩ মার্চে উপরোক্ত শিরোনামে দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশ করেন। প্রতিপক্ষ পণ্ডিত মহল এসব পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশের জন্য তাঁকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলে তৎকর্তৃক 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' এই ছদ্মনামে 'অতি অল্প হইল' (সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩) এবং 'আবার অতি অল্প হইল' (সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩) শীর্ষক বিদ্রূপ কৌতুকে পরিপূর্ণ দুই খানি প্রতি আক্রমণ রচনা করেন। বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ রোধকল্পে আইন প্রণীত না হলেও এসব প্রথার বিরুদ্ধে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিদ্যাসাগরের উপরোক্ত প্রচেষ্টার প্রায় আশি বছর পরে স্বাধীন ভারতে ১৯৫৩ সালে বহু বিবাহ প্রথা আইন পাশ করে রহিত করা হয়।

নারী শিক্ষা, নারী প্রগতি ও নারী মুক্তির জন্য সংগ্রাম নারীজাতির দুর্গতিমোচনের জন্য বিদ্যাসাগরের ছিল আজীবন নিরন্তর ও নিরলস প্রয়াস। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহ অথচ ভক্তি ছিল। ইহাও তাঁহার সুমহৎ পৌরুষের একটি প্রধান লক্ষণ।' তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ রোধ এবং বিধবা-বিবাহের মত শিক্ষামূলক ও সামাজিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, চেয়েছিলেন এই দুর্ভাগা দেশে শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং আত্মপ্রকাশের সবরকমের সুযোগ থেকে বঞ্চিত নারীজাতিকে তার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে। কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তোলার সাহসী সংকল্পে তিনি সফল হয়েছিলেন এবং দক্ষিণ বাংলার বিভিন্ন স্থানে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই কাজে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন এবং অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছেন। তর্ক ও যুক্তিজাল বিস্তার করে কুসংস্কারের ঘেরাটোপ ছিন্ন করেছেন। নিজের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলেছেন, 'আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। চিঠিতে ছোট ভাই শম্ভুচন্দ্রকে লিখেছেন, 'বিধবা বিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।'

এ সম্বন্ধে 'চারিত্রপূজা' নিবন্ধ থেকে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উল্লেখ করা হচ্ছে। তিনি বলেছেন, 'অবশেষে তিনি (ঈশ্বর চন্দ্র) যখন বালবিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেন,তখন দেশের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা গাল মিশ্রিত এক তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। সেই মুষলধারে শাস্ত্র ও গালিবর্ষণের মধ্যে এই ব্রাহ্মণবীর বিদ্যাকে মূলধন করে ব্যবসা ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সাফল্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণে স্বাধীন বাণিজ্য বৃত্তির উন্মেষ ঘটে। তাঁরা বণিকের মত বিত্ত মূলধন করে পণ্যের বাণিজ্য করেছেন। এ সময়ের বাণিজ্যমেধায় শ্রেষ্ঠ কৃতি পুরুষরা হলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি। তবে অন্যদের থেকে বিদ্যাসাগর ছিলেন ব্যতিক্রম এইজন্য যে অন্যদের মত তিনি বিত্তবান ছিলেন না, তিনি বিদ্যাকে মূলধন করে ব্যবসায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃত প্রেস ও প্রেস ডিপোজিটরি স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। জনসাধারণ ও ছাত্র ছাত্রীদের প্রয়োজনে তিনি ১৮৪৭ সাল থেকে বই লিখতে শুরু করেছিলেন, ফলে তিনি হলেন একাধারে গ্রন্থকার, মুদ্রক ও প্রকাশক।

বর্তমান কালের খ্যাতিমান লেখক ও গবেষক শ্রীঅমিত্র সূদন ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন যে, 'বিদ্যাসাগরের বই সে যুগে হাজার হাজার কপি বিক্রি হত। সে যুগের বই-এর বাজারে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক। প্রথম কুড়ি বছরের মধ্যে 'বর্ণপরিচয়'-এর প্রথম ভাগের ষাটটি সংস্করণ ছাপা হয়েছিল।...' পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন, '(শুধু) পুস্তক বিক্রয় হইতে তাঁহার প্রতি মাসে ৫/৬ হাজার টাকা আয় হইত।' বলা বাহুল্য, মহান আত্মা বিদ্যাসাগর তাঁর এই ব্যবসালব্ধ অর্থ সমাজ ও আর্তের সেবায় সারা জীবন ধরে অকাতরে ব্যয় করে গেছেন।

বিদ্যাসাগরের আধুনিক দৃষ্টি ভঙ্গি ঃ বিদ্যাসাগরের আধুনিক মনের প্রসার ও পরিধি পরিমাপ করতে হলে একটা গ্রন্থই রচনা করতে হয়। যাইহোক, 'বিদ্যাসাগর আচারের দুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন, এই তাঁর আধুনিকতার একমাত্র পরিচয় নয়। যেখানে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতুস্বরূপ, সেখানেও তাঁর বুদ্ধির ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে।' বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন কৌলিক আচারনিষ্ঠ সনাতন রাঢ়ীয় দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে; পিতামহ প্রচার করেছিলেন 'এঁড়ে বাছুর' জন্মেছে বলে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'এই অবমানিত দেশে' এ জন্ম 'বিধাতার নিয়মের আশ্চর্য ব্যতিক্রম'। হ্যাঁ, আশ্চর্য তো বটেই, না হলে সাড়ে তিন কোটি দেবদেবী বেষ্টিত হিন্দু বাঙালি

Scanned with OKEN Scanner

সমাজকে তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ বিজ্ঞানমুখী শিক্ষার পাঠ দিলেন কীভাবে? তিনি কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করে একাজ করেন নি। জেদ ও যুদ্ধে তিনি ছিলেন একক। মানুষের মন থেকে কুসংস্কার দূর করে সুস্থ মানবিকতাবোধ জাগিয়ে তুলতে তিনি ছিলেন আজীবন একাগ্রচেষ্ট। তাই গোটা উনিশ শতকের সংস্কারমুক্ত আধুনিক মানসিকতার বিদ্রোহী বিদ্যাসাগর নিঃসংকোচে বলতে পেরেছিলেন, 'আমি দেশাচারের দাস নহি। নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহাই করিব- লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।'

রবীন্দ্রনাথের শেষ বিচার, 'যাঁরা অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে নিয়ে যাবার সারথি-স্বরূপ, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহারথীগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন।' অতএব রবীন্দ্রনাথের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, 'এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।'

কেবল পাশ্চাত্যের জ্ঞানার্জন স্পৃহার জন্যই নয়, মানুষটি যে আধুনিক তার আরও প্রমাণ হাজির করেছেন রবীন্দ্রনাথ, 'তখন সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণেরই (ও বৈদ্যদেরও) প্রবেশ ছিল, সেখানে শূদ্রেরা সংস্কৃত পড়িতে তিনি আজীবন বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। 'সর্ব শুভকরী' নামক একটি সংবাদপত্রে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, বালিকাদের চৌদ্দ বছরের পূর্বে বিবাহ হওয়া উচিত নয়। তিনি নিজের কন্যাদের ১৫/১৬ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহ দেন নি, যা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় একান্তভাবেই প্রথাবিরুদ্ধ বলে গণ্য হত।

বিদ্যাসাগর জীবনব্যাপী যে বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ছিলেন, তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর আধুনিক মানসিকতার পরিচয় রেখেছেন। পরিসর স্বল্প, তাই আবার সেই কবিগুরু-রই একটা পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করছি।

'সংস্কৃত কলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন। বাঙালির নিজের চেষ্টায় ও নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ-স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন; যিনি লোকাচার-রক্ষক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন এবং সংস্কৃত বিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনিই ইংরাজি বিদ্যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।'

দুটি মানবতার পাঠশালার ইতিবৃত্ত

অরবিন্দ দাস

পৃথিবীর দুই প্রান্তে দুটি পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তার একটি ভারতে ১৯০১ সালে। এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন কবি রবীন্দ্রনাথ, তখন তিনি বিশ্বকবি হন নি। অপর বিদ্যালয়টি জার্মানিতে প্রতিষ্ঠা করেন পল বা পাউল গেহিব (Paul Geheed - ১৮৭০-১৯৬১) ও তাঁর সহধর্মিণী এডিথ গেহিব, ১৯১০ সালে। বিদ্যালয়টির নাম 'ওডেন ওয়াল্ড বিদ্যাপীঠ (Oden Wald Schule)। তবে, ইস্কুলটি এখানে স্থায়ী হয়নি। নাৎসিরা জার্মানীতে ক্ষমতায় আসলে গেহিব তাঁর কিছু ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে ১৯৩৪ সালে স্যুইজারল্যান্ডে পালিয়ে যান এবং পুনরায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়টির নাম দেন একোল-দ-উমানিতে (Ecoled Humanite) বা মানবতার পাঠশালা। এটি আসলে ওডেল ওয়াল্ড বিদ্যাপীঠের উত্তর পর্বের নাম। যেমন রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের উত্তরপর্বের নাম হয় 'বিশ্বভারতী' (১৯২১)। গেহিবের বিদ্যালয়টি ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে এখনও সক্রিয়। বর্তমানে পল গেহিবের উত্তরসূরী অ্যার্নিম ল্যুথি ইস্কুলটির দায়িত্বে আছেন।

কুড়িটি বাড়ি ও ছাত্রাবাস নিয়ে গঠিত বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকরা একত্রে একটি বড়ো পরিবারের মত বাস করে। স্থানীয় অঞ্চল থেকে ছাত্র ও শিক্ষকরা এখানে আসেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকেও শিক্ষার্থীরা আসেন। এই বিদ্যালয়টির সঙ্গে বর্তমানে যোগাযোগ রয়েছে মার্টিন কেম্পচেনের; মার্টিন জন্মসূত্রে জার্মান কিন্তু বাংলার গ্রামজীবন আর বাঙালীর প্রাণের ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের টানেই রয়ে গেছেন শান্তিনিকেতনে প্রায় চার দশকের বেশী। প্রসঙ্গত বলি এই স্কুলটির সঙ্গে জহরলাল নেহেরুর যোগাযোগ ছিল। পরে তাঁর কন্যা ইন্দিরার সঙ্গে গেহিবের স্ত্রী এডিথের দেখা সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ হয়। ইন্দিরা তাঁর দুই সন্তানকে নিয়েও এখানে এসেছেন।

যাই হোক, এই বিদ্যালয়টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর বেশ কিছু মিল থাকলেও বর্তমানে অনেক অমিলও চোখে পড়বে। প্রথমত গেহিবের বিদ্যালয়টি বেসরকারি। তবে উভয় বিদ্যালয় আবাসিক। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে গেলে আদর্শবাদী হতে হবে। এখানকার শিক্ষকদের মাইনে সরকারি স্কুলের তুলনায় অনেক কম। রবীন্দ্রনাথের ইস্কুলে প্রথম যুগের সঙ্গে এর মিল ছিল একথা সত্য; কিন্তু বর্তমানে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় আর পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। রবীন্দ্রনাথের কোন প্রভাব বর্তমানে শিক্ষকদের আছে কিনা সন্দেহ। আবাসিক চরিত্রেও অমিল লক্ষনীয়। গেহেরের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা এক একটি দলে ভাগ হয়ে এক একজন শিক্ষকের পরিবারভুক্ত হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা পরিবারের মধ্যে থেকে শিক্ষকদের সঙ্গে পরস্পর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

Scanned with OKEN Scanner

শিক্ষকেরা ছাত্রদের সুবিধা-অসুবিধা, মানসিক গঠন বুঝতে পারেন। শিক্ষার্থীরা নিজের কাজ নিজেরা করে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, ব্রহ্মচর্যা শ্রমের সময়ে গেহিবের বিদ্যালয়ের মতো শিক্ষকরা ছাত্রদের সঙ্গে একই ভাবে থাকতেন, কারণ রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন এটি তপোবন শিক্ষার একিটি আদর্শগত দিক। পরে অবশ্য এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করেন, তিনি বলেন 'যে শিক্ষকরা বয়স্ক, তাঁদের এমন কতকগুলো অভ্যাস, প্রয়োজন ইত্যাদি আছে যা ছাত্রদের জ্ঞানে না আসাই ভাল'। সুতরাং শিক্ষকদের জন্য আলাদা বাসস্থান নির্দিষ্ট হল।

গেহিবের এই ইস্কুলে শিক্ষার্থীরা নিজের খুশিমত বিষয় (Subject) নিয়ে পড়াশুনা করে থাকে, যথা কাঠের কাজ, হস্তশিল্প, মুদ্রণ শিক্ষা, মডেলিং, খেলাধূলা, কম্পিউটার, নাটক, সংগীত, যন্ত্রসংগীত, অঙ্কন ইত্যাদি। ঋতু অনুযায়ী পাঠ্যবিষয়ের ঠিক হয়। যেমন শীতকালে শিক্ষার্থীরা স্কেটিং করে থাকে। জার্মান রবীন্দ্র গবেষক মার্টিন কেম্পচেন শেষবার যখন (২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর) এই বিদ্যালয়ে আসেন, তিনি দেখেন ইস্কুলের সকলেই (শিক্ষক-শিক্ষার্থী) বেরিয়েছেন কালোজাম (Blackberry) কুড়োতে। তিনি লিখেছেন 'এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়তে পারে নাচ-গান-নাটক ও চারুকলার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের কথা'। সত্যিকথা বলতে কী রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে রয়েছে প্রকৃতি পাঠের পরিচয়। ওডেন ওয়াল্ড বিদ্যাপীঠে আরএকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সর্বাত্মক সামানাধিকার এর পরিবেশ। এই বিদ্যাপীঠে জার্মান ও ইংরাজী ভাষায় পঠন-পাঠন ও কথাবার্তা চলে। ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে আসে। বেশিরভাগ শিক্ষক দুটি ভাষাতেই কথা বলেন। আমরা যেমন বাংলা ভাষাতে তুমি ও আপনি ব্যবহার করি, তেমনি এই ইস্কুলে ছাত্র ও শিক্ষক পরস্পরকে তুমি সম্বোধন করে থাকে। সমানাধিকারের আর একটি চাবিকাঠি হল প্রত্যেকে অনাড়ম্বর ও অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করে থাকে।

পল গেহিবের এই বিদ্যালয়ের কথা রবীন্দ্রনাথ জানতে পারেন অরবিন্দমোহন বসুর (১৮৯২-১৯৭৭) মাধ্যমে। প্রসঙ্গত বলি অরবিন্দমোহন বসু হচ্ছেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর বোন স্বর্ণপ্রভা দেবী ও ভগ্নিপতি আনন্দমোহন বসুর পুত্র। নিঃসন্তান জগদীশচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী লেডি অবলা বসু পুত্রবৎ স্নেহ করতেন অরবিন্দকে। জগদীশচন্দ্র তাঁর ভাগ্নেকে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে (১৯০২-১৯০৭ পর্যন্ত পড়েন) ভর্তি করেন। অরবিন্দকে নিয়ে অবলাদেবীর সঙ্গে কবির মতান্তর হয়। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতি ভাগ্নের অতিরিক্ত আকর্ষণ অবলাদেবী পছন্দ করেননি। লেডি বসুর ধারণা হয় রবীন্দ্র ব্যাক্তিত্বের আকর্ষণে অরবিন্দমোহন নির্দিষ্ট কর্তব্য (বিশেষত লেখাপড়া) থেকে ভ্রষ্ট হতে পারে। এই নিয়ে অবলা বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে বিতর্কের শুরু। অবশ্য অরবিন্দমোহনের সঙ্গে কবির সম্পর্ক অটুট ছিল। পরবর্তীকালে অরবিন্দ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং ইউরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেন। ইউরোপ ভ্রমণের সুবাদে অরবিন্দমোহন জার্মানীর বন্ধুদের কাছ থেকে পল গেহিবের এই বিদ্যালয়ের কথা শুনেছিলেন। ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অরবিন্দ এই বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। বিদ্যালয়টি দেখে তিনি যারপরনাই উৎসাহিত বোধ করেন। পরে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে এই ইস্কুল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেন। অরবিন্দমোহন লিখেছেন, 'আমি যে টেগোরের পাউলুসের আলাপ করিয়ে দিতে এত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম তার কারণ তাঁরা দুজনেই "মানব দেবতার" বেদীতে তাঁদের ভালবাসা ও সরল বিশ্বাসকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। দুজনের জীবনে প্রথম ভালোবাসা ছিল মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি, দেশের প্রতি নয়। উভয়েই মনে করতেন শিশুর হৃদয়েই সেই আশ্চর্য জায়গা যেখানে অসম্ভব প্রতিদিন ঘটে'।

টেগোর লিখেছেন, 'প্রত্যেকটি শিশু এই বার্তা নিয়ে পৃথিবীতে আসে, যে ঈশ্বর এখনও মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাননি'। এই দুই মহান শিক্ষাবিদ, একজন পুবের আর একজন পশ্চিমের - দুইজনেই এই কথা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন।

যাই হোক, আনন্দমোহনের উৎসাহে ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ তৃতীয়বার জার্মান পরিদর্শনের সময় (২৯ শে জুলাই থেকে ২ রা আগষ্ট) পল গেহিব ওডেন ওয়াল্ড বিদ্যালয়ে কাটান। পরস্পর আলাপ ও শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করে দু'জনই খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। দু'ই শিক্ষাবিদের শিক্ষা নিয়ে চিঠিপত্রের খুব বেশি আদানপ্রদান হয়েছিল তা বলা যায় না। তবে পল গেহিব তাঁর ইস্কুল নিয়ে বিশ্বভারতীর কোয়ার্টালি পত্রিকায় 'আ স্কুল অফ ম্যানকাইন্ড' নামে দুবার প্রবন্ধ লিখেছিলেন (নভেম্বর ১৯৩৫ ও ১৯৫৯-১৯৬০)।

গেহিবের শিক্ষাভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের কতখানি সাদৃশ্য ছিল তা বুঝতে পারা যাবে এই উদ্ধৃত অংশে। গেহিব লিখেছেন 'প্রত্যেক সভ্য দেশের প্রয়োজন হল বিশ্বজনীন শিক্ষা, যাতে পরিবারে বা সমাজে শিশুর উপরে দুর্ব্যবহার হয় তার প্রতিবিধান করা যায়, শিশু যেমন স্বাধীন ভাবে বেড়ে উঠতে পারে, স্বাধীন শিক্ষা পেতে পারে, সে যেন মানসিকভাবে একজন স্বাধীন ব্যক্তিতে পরিনত হতে পারে, বড় হয়ে উঠে..... জাতীয় শিক্ষাব্যাবস্থা এই জন্য প্রয়োজন, যাতে প্রতিটি শিক্ষা শিশুর দেশের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যে বড়ো হয়ে উঠতে পারে, যেখানে তাঁর মাতৃভাষা তাকে দেশের অন্য মানুষের সঙ্গে নিজেকে এক বলে ভাবতে শেখায় - ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, ব্যক্তি ও সমাজ - সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এই যে দুটি কেন্দ্র, এদের মধ্যেকার টানাপোড়েন আমরা প্রতিদিন অনুভব করি এই রকম একটি 'শিক্ষাপ্রদেশ'এ, ঠিক সেই রকমই, এর পরের ধাপে প্রতিটি জাতির সঙ্গে সমগ্র মানবজাতির যে টানাপোড়েন তার সঙ্গে আমাদের তরুনদের পরিচয় হওয়া উচিত, এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অতিথি

Scanned with OKEN Scanner

হিসাবে অন্য দেশের ছেলেমেয়েদেরই ওডেন ওয়াল্ড বিদ্যালয় যা করে (এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা এক পঞ্চমাংশই বিদেশি) তা যথেষ্ট নয়। মানবজাতির বিদ্যালয়ে আজকের দিনে সব কটি বড়ো সংস্কৃতিরই প্রতিনিধি থাকবে, শুধুমাত্র পাশ্চাত্য সংস্কৃতি নয়, প্রাচ্য ভারতীয়দেরও প্রতিনিধিত্ব থাকবে, বিশেষত চীন ও ভারত থেকে - তাদের নিজস্ব কর্মীসংঘ, তাদের নিজেদের দেশের শিক্ষকেরা থাকবেন সেখানে, যেমন তাদের শিশুরা থাকবে, প্রতিটি জাতির শিশু বিদ্যালয়ে সমান অধিকার ভোগ করবে, শুধুমাত্র তা হলেই পরস্পরকে ঋদ্ধিশালী করে তুলতে পারবে.... শিশুর শিকড় যত দৃঢ়ভাবে তার নিজের সংস্কৃতির ভূমিতে প্রোথিত হতে পারবে, ততই তার যোগাযোগ পূর্ণতর হতে পারবে অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে'।

গেহিবের এই প্রবন্ধটির প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, '... আমার মনে হয়েছিল, আমাদের দিকের পৃথিবীতেও আপনার বক্তব্য প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন, তাই ওটি কোয়ার্টারলিতে প্রকাশিত হয়েছিল। সভ্যতাকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় অজ্ঞানতা মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা - আপনার প্রতিষ্টান 'মোনিয়ের ইনিস্টিউট (ইকোল এর পূর্বতন নাম) এবং আমার 'শান্তিনিকেতন' - এদের মস্ত ভূমিকা আছে এই শিক্ষায়'।

আসলে রবীন্দ্রনাথ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অল্প বয়স থেকেই ভাবনাচিন্তা করেছেন। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপনের আগে জোড়াসাঁকোতে ১৮৯৬ (মাত্র ৩৫ বছর বয়েসে) গৃহবিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছেন ভারতবর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও প্রকৃতিকে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা আলোচনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখেছেন ও বিশ্বাস করেছেন শিক্ষাই হল জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। শিক্ষায় আন্তর্জাতিকতা চিন্তার কথা অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন। তাঁর শিক্ষা বিষয়ক কাজে এতটা আত্মবিশ্বাস ছিল যে তিনি নিজের স্কুল সম্পর্কে বলতে পেরেছিলেন "The best cargo of my life" অর্থাৎ তাঁর সৃজনশীল কাজের থেকেও ইস্কুল (A Poet's School) ছিল উপরে।

দুই শিক্ষাবিদ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ও পল গেহিবের মানবতার আদর্শ, আর্ন্তজাতিক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা, শিশুদের প্রতি যত্ন, শিল্পবোধের শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, সহশিক্ষা, সামাজিক কাজকর্মে সমবেত ভাবনা, অবসর সময়ে সাংস্কৃতিক চর্চা (এর মধ্যে খেলাধূলা, ভ্রমণ, নাটক, গান, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, ঋতু উৎসব ও মনীষীদের জন্ম জয়ন্তী উদযাপনও আছে) ইত্যাদি কাজকর্মের সামঞ্জস্য দেখে অবাক হতে হয়। এঁদের বিদ্যালয়ের পাঠক্রম এর মধ্যে এমন ব্যবস্থা ছিল যাতে শিক্ষার্থীদের দৈহিক, বৌদ্ধিক, নান্দনিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় শুধু ভারত নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আগ্রহ সৃষ্টি করে দিল। তবে একথা সত্য, এই আগ্রহটা ছিল উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চ মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বিদ্যালয় অখনও কোনও আগ্রহ তৈরি হয়নি। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট চিন্তিত ছিলেন। তিনি সাধারণ গ্রামের মানুষদের জন্য ১৯২১সালে তৈরি করলেন 'শ্রীনিকেতন' এবং ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন শিক্ষাসত্র।

দুটি ইস্কুলই গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছেছিল। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পরিকল্পনা দেখলে বোঝা যায় তিনি কীভাবে শিক্ষাকে সূত্রায়িত করেছেন। শিক্ষাসত্রের পাঠক্রম ও কার্যকারিতা দেখে গান্ধিজি এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তাঁর প্রবর্তিত জাতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় এর উল্লেখযোগ্য আখ্যা পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা যাঁরা প্রভাবিত হয়েছেন তাঁরা দেশের বিভিন্ন প্রদেশে কর্মের মধ্যে তা প্রয়োগ করেছেন। শিক্ষা বিষয়ক কাজ ও পরীক্ষানিরীক্ষায় কোনও না কোন ভাবে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীর প্রভাব পড়েছে। এদের তৈরি বিদ্যালয়গুলি দেখলে মিনে হবে দুই মনীষী এখানে অবস্থান করছেন, শুধু বিদ্যালয় গঠন নয় গ্রামে গঞ্জে সমাজের নানা সমস্যা নিয়ে তাঁরা কাজ করে চলেছেন। স্থান সংকুলানের জন্য তাঁদের কথা অন্য প্রসঙ্গে বিস্তারিত উল্লেখ করা যাবে।

যাই দু'ই শিক্ষাবিদ প্রসঙ্গে ফিরি। এই দু'ই শিক্ষাবিদের সম্পর্কে বেশি দিনের নয়। তবে তাঁদের মধ্যে আন্তরিকতা তৈরি হয়েছিল দুই মানবিক বিদ্যালয়কে ঘিরে। রবীন্দ্রনাথের ৭০ বছর উপলক্ষে ১৯৩১ সালে 'Du Golder Book of Tagore' বইটির প্রকাশ হয়েছিল জার্মান ভাষায়, তাতে পল গেবির অন্তরের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে ছোট নিবন্ধ রচনা করেন। ১৯৬১ সালে গেহিবকে বিশ্বভারতী 'দেশিকোত্তম' প্রদান করে। কিন্তু তিনি এই পুরষ্কার নিজের হাতে গ্রহণ করতে পারেন নি। কারণ তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। তবে সংবাদটি তিনি পেয়েছিলেন। পল গেহিবের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী এডিথ বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে একটি চিঠিতে লেখেন, '....আমার দৃঢ় বিশ্বাস কবি টেগোর এবং আমার প্রিয় স্বামী চিরকাল উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ভাস্বর হয়ে থাকবেন - তাঁদের প্রতীতি, তাঁদের অর্ন্তদৃষ্টি, তাঁদের সাহস চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে'।

পরিশেষে কামনা করি দুই শিক্ষাবিদের মানবিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বমহিমায় বিশ্বের মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাক।

সহায়কগ্রন্থের ঋনস্বীকারঃ

১) *রবীন্দ্রসূত্রে বিদেশীরা - সমীর সেনগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, বাংলা ১৪১৭ সাল।*

২) *অনুভবে অনুধ্যানে রবীন্দ্রনাথ - মার্টিন কেম্পচেন, কারিগর, ২০১৬ সাল।*

Scanned with OKEN Scanner

সুচিত্রা মিত্র

স্বপন সোম

সুচিত্রা মিত্রের গান শুনে কবি বিষ্ণু দে লিখেছিলেন, '.... মনে রং ধরে সুগন্ধে ঘনায় রবীন্দ্রসংগীতে / নন্দিত জীবনে নির্ভীক অজস্র ফুল ফোটে / সার্থক জন্মের মাগো শিকড় ছড়ায় বাহিরে ও ঘরে /... অলৌকিক বাগানে অন্দরে অন্ধকারে পাথরে কাদায় ভিজে / অন্তরে অন্তরে গানে গানে মাটিতে কাঁকরে জীবনের ভীতে।' বিষ্ণু দে -র দীর্ঘ এই কবিতারটির নামও ছিল 'সুচিত্রা মিত্রের গান শুনে'। আরেক কবি সুচিত্রার গানে পৌঁছে যান অনন্ত ভুবনে। অরুণ মিত্র লিখলেন, '... আমি ঘরের মধ্যে গান শুনি, / ঘর? কই ঘর? / আমি তো এক অনন্ত ভুবনে।' কবির এই উপলব্ধি ও তার প্রকাশে কোন অতিশয়োক্তি নেই। এক অনন্ত ভুবনেই পৌঁছে দেন সুচিত্রা মিত্র বারে বারে।

শুরু থেকেই যেন তাঁর সবকিছু অন্যরকম। বিহারে চলন্ত এক ট্রেনে সুচিত্রার জন্ম, অখ্যাত ছোট এক স্টেশন, গুজুন্ডি-তে সে ট্রেন থামিয়ে দিতে হয়েছিল। এই স্টেশনের নাম থেকেই বুঝি সুচিত্রার ডাকনাম 'গজু'। বাবা স্বনামধন্য সৌরিন্দ্রমোহন একদিকে সাহিত্যপ্রেমী- গল্প, উপন্যাস, গান লিখেছেন, আবার পেশায় আইনজীবী। যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন 'ভারতী' পত্রিকা। তাঁর লেখা গান, 'চন্ডীদাস' (১৯৩২) ছবির 'ফিরে চল আপন ঘরে' বিশ্রুত শিল্পী, গায়ক-অভিনেতা কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কণ্ঠে খুবই বিখ্যাত হয়েছিল। ছোটবেলা কেটেছে উত্তর কলকাতার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে (বিধান সরণি) অধুনালুপ্ত মিত্রা সিনেমার কাছে। বাবার কাছে সাংস্কৃতিক জগতের মানুষজন আসতেন, মা সুবর্ণলতা নিজে অর্গ্যান বাজিয়ে গান গাইতেন। মা গাইতেন রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যা হল গো মা', ছোট সুচিত্রা কিছুই বুঝতেন না, বোঝার কথাও নয়, কিন্তু চোখ জলে ভরে উঠত। পরে এক স্মৃতিচারণে এবিষয়ে বলেন 'কেন কাঁদতাম তখন বুঝিনি কিন্তু আজ বুঝি- সুরে কথায় মিলে এ গান কী অপরূপ রূপে সামনে এসে দাঁড়াত, কোথায় তার আবেদন গিয়ে পৌঁছাত এবং কেন সেদিন এ গান অবোধ শিশুমনকেও ব্যাকুল করে তুলতো এমন করে।' এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের গানের পরিমন্ডলেই বেড়ে উঠেছিলেন সুচিত্রা। ছবি-আঁকা, গল্প-কবিতা লেখা, নাটক - সবেতেই আগ্রহ ছিল, তবে গানই সবচেয়ে ভালো লাগতো। শুনে সহজে গান তুলে নিতে পারতেন,গান করতেন। পিতৃবন্ধু পঙ্কজকুমার মল্লিক প্রায়ই বাড়িতে আসতেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গ লাভ করেছিলেন।

১৯৩৫ - এ বেথুন কলেজিয়েট স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন, সেখানে পেলেন রবীন্দ্রনাথের গানের একটা প্রাথমিক পাঠ। ১৯৪১ - এ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর, বৃত্তি নিয়ে সুচিত্রা চলে আসেন শান্তিনিকেতনের সংগীতভবনে গান শিখতে। শিক্ষক হিসাবে পেলেন রবীন্দ্রনাথের গানে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে, উচ্চাঙ্গ সংগীতে ভি ভি ওয়াঝলওয়ারকে। গানের পাশাপাশি এস্রাজ, তবলাও শিখেছিলেন। শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গানের সঙ্গী রূপে পেলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, অরুন্ধতী গুহঠাকুরতাকে। ক্রমশ কণিকা, নীলিমা তো গানেই সুখ্যাত হলেন, কিন্তু অরুন্ধতী গেলেন অভিনয়ে, আর সেখানেই প্রতিষ্ঠা পেলেন।

সুচিত্রার জীবনে ১৯৪৫ সাল বেশ ঘটনাবহুল এবং নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সংগীতভবন থেকে ডিপ্লোমা পেলেন। লন্ডনের Tagore Hyme Society - Tagore Hyme পুরস্কারে ভূষিত হলেন ধ্রুপদ ও টপ্পাঙ্গের রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার জন্য। আর সে-বছরেরই শেষদিকে ডিসেম্বরে HMV থেকে তার প্রথম রেকর্ড বেরল, রবীন্দ্রসংগীত - 'হৃদয়ের একূল ওকূল' ও 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যামসমান' (এন-২৭৫৬৪)। নিশ্চিত প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর-লেখা প্রথম রেকর্ডেই বুঝে নেওয়া যায় সুচিত্রার কণ্ঠের স্বতন্ত্র দীপ্তি, স্বরক্ষেপের দ্রীপ্রতা। তার পর এগিয়ে গেছেন দৃপ্ত পদক্ষেপে। তাঁর গান শুনে বিশিষ্ট সংগীতবোদ্ধা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মনে হয়েছিল '... নিঃসংশয়ে এঁদের মধ্যে সেরা হচ্ছে সুচিত্রা মিত্র। সে বেশ গলা ছেড়ে, পুরো দমে গান গায়। এর মধ্যে কোন গোঁজামিল নেই। গলা হয়তো তার রমা অমিয়ার মতো অতো মিষ্টি নয়, কিন্তু খুবই জোরালো। আর তার সাবলীলতা -- সে একটা দেখার এবং শোনার জিনিস বটে। 'আমি প্রথমবার তার গান শুনি ১৯৪৩ বা ১৯৪৪ সালে। তারপর দিনদিন সে এগোচ্ছে। আজ সে পৌঁছেছে রবীন্দ্রসংগীতের সিদ্ধির চরম বিন্দুতে। তার ছন্দজ্ঞান অসামান্য। মেয়েরা সচারাচর তালে খাটো হয়। কিন্তু সুচিত্রা নিখুঁত। মনে হয় দিনেন্দ্রনাথ বুঝি ফিরে এলেন।' ধূর্জটিপ্রসাদের পর্যবেক্ষণ সঠিক। পরম্পরাগত ভাবে সুচিত্রা পেয়েছেন এই গায়ন। রবীন্দ্রনাথ থেকে দিনেন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ থেকে শান্তিদেব ঘোষ, শান্তিদেব থেকে সুচিত্রা। রেকর্ডে গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ, বিচিত্র পর্যায়ের প্রায় সাড়ে তিনশোর মত গান। নানা ভাবের, নানা স্বাদের, নানা মেজাজের গান। তাঁর অনুভবী নিবেদনে 'অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে' বা 'আজ আকাশের মনের কথা ঝরঝর বাজে', ছবি হয়ে ফোটে 'ঝরঝর বরিষে বারিষধারা' বা 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগণে'। মৃত্যুশোকে শুশ্রূষা দেয় তাঁর কণ্ঠের 'সমুখে শান্তিপারাবার' বা 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক'। 'না বাঁচাবে আমায় যদি মারবে কেন তবে' তাঁর কণ্ঠে যথার্থ আর্তি হয়ে ফোটে। প্রাণ পায় স্বদেশবোধক 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' বা 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'।

বিশ্বাস্যোগ্য করে তোলেন এক কালো মেয়ের কথা 'কৃষ্ণ কলি আমি তারেই বলি' গানে। একক রেকর্ড ছাড়া এল পি রেকর্ডে ধৃত 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'চন্ডালিকা', 'চিত্রঙ্গদা'য় সার্থকভাবে অংশ নিয়েছেন। বিশেষত 'চন্ডালিকা'য় মেয়ে

Scanned with OKEN Scanner

প্রকৃতির ভূমিকায় তাঁর অননুকরণীয় অভিব্যক্তিময় গান ভোলা যাবে না। কিছু ছবিতে নেপথ্যে রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন, 'সন্দীপন পাঠশালা', 'কামনা', 'অনন্যা (১৯৪৯)' বা 'সহসা (১৯৫২)' -য়। রবীন্দ্রসংগীতই তাঁর মূল ক্ষেত্র, তবে পাশাপাশি অনান্য গান যোগ্যতার সঙ্গে গেয়েছেন, যেমন অতুলপ্রসাদের 'একা মোর গানের তরী', 'কে তুমি বসি নদীকূলে', ব্রহ্মসংগীত কালীনারায়ণ গুপ্তের 'এ গো দরদী', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এ কি মোহের ছলনা', আধুনিক - বাবা সৌরিন্দ্রমোহনের লেখা পঙ্কজকুমার মল্লিকের সুরে 'তোমার আমার ক্ষণেক দেখা' ও 'ফিরে তুমি আসবে না'। তবে অন্যান্য ধারার গানের প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে বলার তাঁর গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সংযোগ ও গানের কথা। গত শতকের চারের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ফ্যাসিবাদ পরাভূত, দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা করুণ, ভারতবর্ষের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। মন্বন্তর, শ্রমিক ধর্মঘট, ছাত্র মিছিলে উত্তাল কলকাতা। সুচিত্রার দুই দিদি আগেই বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন, সুচিত্রাও প্রাণিত হলেন বামপন্থী আদর্শে, যুক্ত হলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে। মাঠে ময়দানে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের গান গেয়ে বেড়ালেন। তাঁর নির্ভীক লড়াকু মানসিকতার পরিচয় নানাভাবে পাওয়া গেল। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় ঘটা এক ভয়াবহ দাঙ্গার বিরুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিকরা এক প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হয়েছিলেন। এই মিছিলের অন্যতম সংগঠক চিন্মোহন সেহানবীশ এ বিষয়ে লিখেছেন - 'মনে পড়ে দাঙ্গার বিরুদ্ধে লেখক ও শিল্পীদের সেই অপূর্ব অভিযান। রাস্তার মোড়ে মোড়ে যখন সে মিছিল পৌছাচ্ছিল, নিমেষের মধ্যে মিছিলের গাড়িগুলিকে ঘিরে ফেলছিল হাজার হাজার মানুষ। তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে সুচিত্রা মিত্র গান ধরলেন 'সার্থক জনম মাগো'। সুচিত্রা বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী আর তাঁর কণ্ঠের ওই গান যে কী -- যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই জানেন। তবু মনে হয় দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতার শ্রীহীন রাস্তায় সেদিন তিনি মনপ্রাণ ঢেলে যে গান গেয়েছিলেন তাঁর যেন তুলনা নেই।' গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের এক লেখায় আরেকটি উল্লেখ্যোগ্য ঘটনার কথা - '১৯৪৮ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় যুব সম্মেলন। সেই সম্মেলনের শেষ পর্বে ডিক্সন লেনে এক ঘরোয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কমিউনিস্ট বিরোধী সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীরা গুলি চালায় সমাগত অতিথি যুববৃন্দকে লক্ষ্য করে। তাঁদের প্রাণ রক্ষা পায়। কিন্তু তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে শহিদ হল দুই তরুণ সংস্কৃতিকর্মী - ভবমাধব ঘোষ ও সুশীল সেন। দক্ষিণ কলকাতার ছাত্রদের এক প্রতিবাদ সমাবেশে, সশস্ত্র আক্রমনের বিপদ আছে জেনেও খোলা মাঠে টেবিলের উপরে দাঁড়িয়ে সুচিত্রা আবার গাইলেন রবীন্দ্রনাথের সেই গান 'সার্থক জনম আমার'। সেও এক স্মরণীয় মুহুর্ত। ১৯৪৭ -এ পশ্চিমবঙ্গে বিনা বিচারে আটকের কালাকানুন জারির প্রেক্ষিতে নানা প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল এলেন কলকাতায় এই আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্য নিয়ে, সেদিনই বেতারে সুচিত্রার গান সুচিত্রা নির্ভয়ে গাইলেন 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে', বেতার কর্তৃপক্ষ তখন সুচিত্রার গানের প্রচার কিছুদিন বন্ধ রাখে, কিন্তু সুচিত্রা হার মানেন নি। ১৯৫১ তে বার্লিনে বিশ্ব যুব উৎসবে গেলেন সুচিত্রা। রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করলেন। এবিষয়ে গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সঠিক প্রতিক্রিয়া 'সমাজতন্ত্রের জগতে রবীন্দ্রনাথের গান তার আগে এমন করে কেউ পৌঁছে দিয়েছিলেন বলে আমার তো মনে পড়ে না'। দাঙ্গার বিরুদ্ধে শান্তি মিছিলে বা নিকারাগুয়ার মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে টাকা তোলার অনুষ্ঠানে - সর্বত্র সুচিত্রা উপস্থিত তাঁর উজ্জীবিত কণ্ঠের রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে। গণ-আন্দোলনেও রবীন্দ্রনাথের গানের যে একটা সদর্থক ভূমিকা থাকতে পারে তা বোঝা গেল। এক্ষেত্রে দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কথাও স্মরণযোগ্য। আবার রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া গণচেতনার গানও গেয়েছেন সুচিত্রা। ১৯৫১ তে সলিল চৌধুরীর কথায়-সুরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের এক রেকর্ডে সুচিত্রা গাইলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রমুখের সঙ্গে 'ধন্য আমি জন্মেছি মা', 'আমাদের নানান মতে'। আর এক রেকর্ডে ১৯৫৪ তে অনল চট্টোপাধ্যায়ের সুরে অন্যান্যদের সাথে শোনালেন 'আজ বাংলার বুকে' (কথা মন্মথ ভট্টাচার্য্য) ও 'কোথায় সোনার ধান' (কথা অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়)। রবীন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' সুচিত্রার কণ্ঠে বিখ্যাত। সেই কৃষ্ণকলিকে নিয়ে অন্যকম গান বাঁধলেন সলিল চৌধুরী - 'সেই মেয়ে', তাকে রূপ দিলেন সুচিত্রা ১৯৫০ এ। এখানে উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণকলি' সুচিত্রা রেকর্ড করেছিলেন ১৯৬১ সালে।

গানের পাশাপাশি আবৃত্তি, অভিনয়ও করেছেন। বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেছেন 'বিসর্জন', 'তপতী', 'মুক্তধারা', 'নটীর পূজা' প্রভৃতি নাটকে। চলচ্চিত্রেও তাঁকে পাওয়া গেছে উমাপ্রসাদ মৈত্রের 'জয়বাংলা' (১৯৭১), মৃণাল সেনের 'পদাতিক' (১৯৭৩), ঋতুপর্ণ ঘোষের 'দহন' (১৯৯৭) এ এবং বিষ্ণু পালচৌধুরীর একটি টেলিফিল্ম 'আমার নাম বকুল'-এ। তাঁকে নিয়ে তথ্যচিত্র রয়েছে রাজা সেন ও সুব্রত ঘোষের।

তাঁর বিচিত্র কর্মধারার একটি দিক - লেখালেখি। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে যেমন গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ লিখেছেন, তেমনি ছোটদের জন্যও কলম ধরেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথের সংগীতজীবন', রবীন্দ্রসংগীত জিজ্ঞাসা', 'খেয়াল খুশি'। চারের দশকের শেষদিকে কলকাতায় রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষায়তন 'রবিতীর্থ' প্রতিষ্ঠা করেন দ্বিজেন চৌধুরীর সহায়তায়।

১৯৬৩ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। অবসর ১৯৮৪ তে। তাঁর সময়েই আলাদা ভাবে রবীন্দ্রসংগীত বিভাগ তৈরি হয়। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাওয়া অসংখ্য পুরস্কারের মধ্যে উল্লেখ্য পদ্মশ্রী (১৯৭৪), সংগীত নাটক এ্যাকাডেমি পুরস্কার ও শিরোমণি পুরস্কার (১৯৮৫) ইত্যাদি।

বহুবর্ণে রঞ্জিত এই মানুষটির পথচলা থেমে গেল ২০১১

Scanned with OKEN Scanner

এর ৩ জানুয়ারি। এক ব্যাতিক্রমী বৈচিত্রময় জীবনের পরিসমাপ্তি। জন্মশতবর্ষে রইল আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি।

ঋণস্বীকার ঃ

১) মনে পড়ে - সুচিত্রা মিত্র, (অনুলিখন অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়) আজকাল ১৯৯৫

২) শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র, পঞ্চাশ বছরের সংগীতজীবন - ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন ও সাউন্ড উইং রেকর্ড কম্পানী, ১৯৯৯

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধকে কোনো শক্তি ধ্বংস করতে পারবে না

তানভীর মোকাম্মেল

তানভীর মোকাম্মেল বাংলাদেশের সুপরিচিত একজন চলচ্চিত্রনির্মাতা ও লেখক। তানভীর মোকাম্মেল দশবার জাতীয় পুরষ্কার পেয়েছেন এবং বাংলাদেশ সরকারের তএকুশে পদকদ-এ ভূষিত হন। বিভিন্ন সময়ে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে ও সিনে সেন্ট্রাল ও আইজেস্টাইন সিনে ক্লাবের আয়োজনে এপার বাংলায় তানভীর মোকাম্মেলের চলচ্চিত্র; নদীর নাম মধুমতী, চিত্রা নদীর পারে, লালসালু, লালন, রাবেয়া, জীবনঢুলী, রূপসা নদীর বাঁকে এবং ১৯৭১, সীমান্তরেখা, অয়ি যমুনা, অচিন পাখী, কর্ণফুলীর কান্না, স্বপ্নভূমি, তাজউদ্দীন আহমদ নিঃসঙ্গ সারথি, বস্ত্রবালিকারা, ছবিগুলো দেখানো হয়েছে। গত ২২ সেপ্টেম্বর তানভীর মোকাম্মেল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গবেষিকা দেবস্মিতা মহাজনকে বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে একটি সাক্ষাৎকার দেন। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় 'নাগরিক' - এর এই সংখ্যায় সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হল।

বর্তমান সময়কালে সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশে যে বিক্ষোভ-আন্দোলন সংগঠিত হল তার খবর সংবাদপত্র এবং বৈদ্যুতিন ও গণমাধ্যমের সূত্রে আমরা কিছু কিছু জানতে পারছি। আপনার দেশে যে সব ঘটনা ঘটছে সেগুলো আপনি কীভাবে দেখছেন?

আপাতদৃষ্টিতে এটি ছিল ছাত্র-জনতার একটি গণ-আন্দোলন। কিন্তু নেপথ্যে তা ছিল শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটানোর জন্য আমেরিকার সিআইএ ও পাকিস্তানের আইএসআই দ্বারা পরিকল্পিত, মার্কিন প্রশাসনের অর্থায়ন ও সহযোগিতায় জামাত-ই-ইসলামী, হিজবুত তাহরীর এবং অন্যান্য ইসলামি শক্তিগুলির এক অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটা অংশেরও যোগ ছিল। সংঘর্ষে এতজন ছাত্র ও তরুণের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। কিন্তু এসব করুণ মৃত্যু থেকে সৃষ্ট সহানুভূতিকে পুঁজি করে অত্যন্ত সুকৌশলে এক পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়েছে। সমগ্র বিষয়টিকে কেউ 'রঙীন অভ্যুত্থান' বলে অভিহিত করতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশে প্রায় এই রকম ঘটনা ঘটিয়ে নাম দেওয়া হয়েছিল 'আরব বসন্ত'। কিম্বা ইউক্রেনের কথাই ধরুন। যেসব সাময়িক গণঅভ্যুত্থান আসলে মার্কিন ভূরাজনৈতিক স্বার্থকেই সাহায্য করেছে। পাকিস্তানে নির্বাচিত ইমরান খান সরকারকে ফেলে দেওয়ার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যাঁর উপর ছিল, সেই মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ডোনাল্ড লুর উপরেই দায়িত্ব পড়ে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটানোর এবং সেই কাজে তিনি ও তাঁর টিম সফল হয়েছেন। আসলে আমেরিকা চাইছিল বাংলাদেশ মার্কিন নেতৃত্বাধীন এবং ভারত ও চীনবিরোধী ইন্দো-প্যাসিফিক জোটে যোগ দিক। কিন্তু শেখ হাসিনা সেটা চাননি। তাছাড়া শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশকে ব্রিকসদ-এ যোগ দেওয়ানোর চেষ্টা করছিলেন। চাইছিলেন বি-ডলারীকরণ বা ডলারকে বাদ দিয়ে চীন, ভারত ও রাশিয়ার সাথে তাদের মুদ্রায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। এখন ডলার হচ্ছে মার্কিন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রধান শক্তি। ফলে শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার আমেরিকার প্রিয় ছিল না। এটা ঠিক যে শেখ হাসিনার সরকারে ও ওঁর আশেপাশে অনেক দুর্নীতিবাজ লোকজন ছিল। তবে দুর্নীতির বিষয়টা অনেকটা অজুহাত হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ আমেরিকা যাঁকে বসিয়েছে সেই আমেরিকা থেকে উড়ে আসা প্রফেসর ইউনুসের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির সুস্পষ্ট অভিযোগ হয়েছে। ওঁর প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কল্যাণ ট্রাস্টের পঁচিশ কোটি টাকা তছরূপ করার অভিযোগে ওঁর কারাদন্ডেরও আদেশও হয়েছিল। শেখ হাসিনার সরকারের পতন না হলে দুর্নীতির দায়ে ওঁকে জেল খাটতে হত। এছাড়া ওঁর বিরুদ্ধে ছয়শ পঁয়ষট্টি কোটি টাকা কর ফাঁকির একটা মামলা রয়েছে। তাই দুর্নীতি বা অপশাসন নয়, শেখ হাসিনার সরকারকে হঠিয়ে ইউনুস সরকারকে বসানোর কারণটা মূলত ভূ-রাজনৈতিক।

আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি আসলে বাংলা ভাগের এক ধরণের পরিণতি?

প্রত্যক্ষভাবে অবশ্যই নয়। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতির সব বড় ঘটনা, বা বলা যায়, এই উপ-মহাদেশের বড় বড় রাজনৈতিক ঘটনাবলী কোনও না কোনও ভাবে ১৯৪৭-এর দেশভাগের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যদিও কখনও কখনও তা তেমন সুস্পষ্ট নয়। বাংলাদেশের বিক্ষোভকারীরা যেসব ভারতবিরোধী (পড়ুন হিন্দুবিরোধী) শ্লোগান দিয়েছিল তা প্রমাণ করে যে সাম্প্রদায়িকতা এখনও বাংলাদেশের রাজনীতিতে ও দেশটার জনগণের মানসিকতায় এক বড় চালিকাশক্তি। শেখ হাসিনা সরকারের পতন ও তাঁর দেশত্যাগ করার পরে অনেক হিন্দু বাড়ি, সম্পত্তি ও মন্দিরে হামলা হয় বা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ এবং সাম্প্রদায়িকতার যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা

Scanned with OKEN Scanner

অতীতে গিয়েছি, এসব ঘটনা কোনো না কোনোভাবে তো সেই অভিজ্ঞতারই এক ধরণের অনুরণন। সুতরাং ১৯৪৭ সালের বাংলাভাগের সময় যে বিষয়গুলি প্রাসঙ্গিক ছিল এখনকার ঘটনাবলীতেও সেসবের কিছু প্রাসঙ্গিকতা তো রয়েই গেছে।

প্রশাসক হিসাবে শেখ হাসিনা কি কি ভুল করেছেন যা সাধারণ মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তুলল? আমি মনে করি কিছু কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অর্থনীতির ক্ষেত্রে, শেখ হাসিনার সরকারের বেশ সাফল্য ছিল। তবে ওই সরকারটার বেশ কিছু দুর্বলতাও ছিল। শেখ হাসিনা নিজের দলের ও দেশের প্রায় সর্বস্তরে ছড়ানো দুর্নীতির বিরুদ্ধে তেমন কোনো শক্ত পদক্ষেপ নেননি। ওঁর পতনের আরেকটি কারণ হল ওঁর বাড়তি কথা বলার অভ্যাস। এই বাচালতা কখনও কখনও এমন পর্যায়ে চলে যেত যা মোটেই রাষ্ট্রনায়ক সুলভ নয়, বরং তা মানুষের মনে বিরক্তিরই উদ্রেক করত। ওঁর বাকসর্বস্বতা, অত্যধিক আত্মবিশ্বাস এবং একগুঁয়েমি, যা সৃষ্ট হয়েছিল ওঁকে ঘিরে রাখা তোষামোদকারীদের কারণে, ওঁকে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা অন্ধকারেই রেখেছিল। কিন্তু শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে চক্রান্তটিও ছিল বিশাল, বহুধা বিস্তৃত এবং অনেক গভীরে প্রোথিত যা মোকাবেলা করার কৌশল ওঁর জানা ছিল না। আর এর জন্য ওঁকে বা ওঁর দল আওয়ামী লীগকেই শুধু নয়, গোটা বাংলাদেশকেই চরম মূল্য দিতে হল। বলা চলে, বাংলাদেশের মানুষ গামলার দূষিত জলের সাথে শিশুটাকেও যেন ছুঁড়ে ফেলল! আমার মনে হয় এজন্য ভবিষ্যতেও বাংলাদেশের মানুষকে আরো অনেক মূল্য দিতে হবে। বাংলাদেশ এখন একটা গোড়া ইসলামী শাসনের অন্ধকারময় যুগের দিকে পা বাড়িয়েছে। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলে সেটা হত না। আমার বিবেচনায়, শেকসপিয়র 'কিং লীয়র'-এ যেমনটা বলেছিলেন, শেখ হাসিনাও বাংলাদেশের ইতিহাসে তেমনই একজন নেত্রী, যিনি 'more sinned against the sinning'।

আপনি ১৯৪৭ এর দেশভাগের কথা জেনেছেন, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ও এখনকার ঘটনাবলীও প্রত্যক্ষ করছেন। একজন ব্যক্তি হিসেবে কি ভাবে এই পরিস্থিতির মূল্যায়ন করবেন?

১৯৪৭-এর দেশভাগ এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ দুটোই যুগান্তকারী দুই ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৪৭-এর ঘটনায় এই উপমহাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা পরিবর্তিত হয়ে গেল, জনবিন্যাসও পাল্টে গেল। আর ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধও ছিল আরেক মহাকাব্যিক ঘটনা। মুক্তির সেই সংগ্রামে ত্রিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়, দুই লক্ষ নারী ধর্ষিতা হয়, এক কোটি মানুষ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। উভয় ঘটনাতেই হিন্দু জনগণ ব্যাপকভাবে গণহত্যার শিকার হয়। এই দুটি ঘটনাই আমাদের এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তিটাকেই বলতে পারেন ওলোট-পালট করে দিয়েছিল এবং তা প্রায় এক চিরস্থায়ী প্রভাব রেখে চলেছে। সে তুলনায় বাংলাদেশের ২০২৪-এর ছাত্র গণ-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট দাঙ্গা ও অরাজকতার ঘটনা ব্যাপকতায় অনেক কম এবং এর প্রভাবও অনেক কম রইবে।

আজকের ছেলেমেয়েরা যারা বর্তমান পরিস্থিতি বোঝার পক্ষে অতি তরুণ তাদের কাছে 'বাংলাদেশ'কে কিভাবে বর্ণনা করবেন? বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে একটি রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। শুরু থেকেই দেশটি নানা রকম অস্থিতিশীলতা ও উত্থান-পতনের কারণে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তা সত্বেও দেশটা সামনেই এগিয়ে যাচ্ছিল। এক সময়ের পশ্চাৎপদ পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক কালের অর্থনৈতিক উন্নতিটা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাগতভাবে এক। আবার জনগণের নয় শতাংশ বাদে সব মানুষই একই ধর্মের অনুসারী। আমার অনুমান, বর্তমান সময়ের এই অস্থিরতা সত্বেও, বাংলাদেশের জনগণ শান্তি চায়। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে যারা এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় রয়েছে, বিশেষত ইসলামী শক্তিগুলি, তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশেও আধিপত্যবাদী ইসলামী ধর্মীয় শাসন কায়েম করার চেষ্টা চালাতে থাকবে। এর ফলে দেশটার মানুষের মধ্যে গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতা ব্যাপক হারে বাড়বে। এই বিষয়ে এখনই আমরা অনেক অশুভ ইঙ্গিত পাচ্ছি। তাই ১৯৭১-এ স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার যে স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম আগামীতে তা গভীর হুমকির মধ্যে পড়বে বলেই আমার ধারণা। বাংলাদেশের সমাজ বহুত্ববাদের বদলে পরিবর্তিত হয়ে ক্রমশ একরৈখিক ইসলামীকরণের দিকে চলতে থাকবে এবং আগামী দিনে এই অভিমুখ আরও তীক্ষ্ন হবে। এর ফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরাও নৃতাত্ত্বিকভাবে ভিন্ন পাহাড়ী জনগোষ্ঠী বিপদে পড়বেন। তবুও আমি বিশ্বাস করি, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্মৃতি ও মূল্যবোধগুলো বাংলাদেশের মানুষের মনোজগতে এত গভীরভাবে প্রোথিত যে তাকে সর্বাংশে উপড়ে ফেলা সম্ভব হবে না।

(ইংরেজিতে দেওয়া সাক্ষাৎকারটির ভাষান্তর করেছেন মনিরুল হক)

Scanned with OKEN Scanner

বাংলাদেশ কি মিশর হতে যাচ্ছে

বিজয় প্রসাদ

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার পরদিন আমার এক বন্ধুর ফোনকল পেয়েছিলাম। বন্ধুটি সেদিন ঢাকার রাস্তায় বেশ কিছু সময় কাটিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, কীভাবে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরা বিশাল বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিল এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল। আমি তাঁকে শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক কাঠামো ও তাদের রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। তিনি তখন বলেন, বিক্ষোভটি সুসংগঠিত বলেই মনে হয়েছে। ছাত্ররা সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের জন্য আন্দোলন শুরু করলেও তা শেষ পর্যন্ত সরকারের পদত্যাগের দাবি পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। তবে শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার কয়েক ঘণ্টা আগেও মনে হয়নি, সরকারের পতন হতে পারে। সবাই ভেবেছিল, সরকার আরও সহিংস হবে।

বাংলাদেশে এই বিক্ষোভ একেবারে আকস্মিক নয়। এটি মূলত এক দশক আগে শুরু হওয়া ক্ষোভের চক্রের একটি অংশ। দাবিগুলোও বেশ পুরোনো। যেমন কোটা সংস্কার করা, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভালো আচরণ করা, সরকারি দমন-পীড়ন বন্ধ করা ইত্যাদি। আপাত সরল এই দাবিগুলো হয়তো সহজেই সমাধান করা যেত। কিন্তু কোটা সংস্কারের দাবিগুলো দেশের অভিজাত শ্রেণি সব সময় মরিয়া হয়ে দমন করার চেষ্টা করেছে। এই কোটার সঙ্গে দেশের জন্মের ইতিহাস জড়িত। কারণ সিংহভাগ কোটা দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দ ছিল, যারা ১৯৭১ সালে জীবন বাজি রেখে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিলেন। অনেকে জীবন দিয়েছেন, অনেকে অঙ্গ-প্রতঙ্গ হারিয়েছেন।

তবে এটিও স্বীকার করতে হবে যে, এ ধরনের কোটা ব্যবস্থা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বহাল রাখা উচিত নয়। একই সঙ্গে এটিও স্বীকার করতে হবে যে, কোটা ব্যবস্থার সঙ্গে দেশের তরুণদের কর্মসংস্থানের সমস্যা এবং দেশে ইসলামপন্থী শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়টি জড়িত। স্মরণ করা কর্তব্য, বাংলাদেশের ইসলামপন্থী দলগুলো মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে আপস করেছিল।

যাই হোক, ২০১৮ সালে একবার কোটাবিরোধী আন্দোলনের সময় শেখ হাসিনা এই কোটা ব্যবস্থাই বাতিল করে দিয়েছিলেন। এরপর কোটা ব্যবস্থা বহাল থাকবে কি থাকবে না, চলতি বছরে তার সিদ্ধান্ত চলে যায় আদালতে। হাইকোর্ট যুক্তি দেন, কোটা ব্যবস্থা পুনর্বহাল করতে হবে। কিন্তু পরে জুন মাসে, সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন, কোটা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পুনর্বহাল করা যাবে না, আংশিকভাবে করতে হবে। এই রায়ের পর আন্দোলন নতুন রূপ পায়। আন্দোলনকারীরা শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে আন্দোলন শুরু করে।

সহনীয় প্রশাসন ও ব্যবসা সময়ের দাবি ঃ আজ থেকে এক দশক আগেও ঢাকার শাহবাগ চত্বরে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছিল। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নানা অভিযোগে জামায়াত নেতা কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিলেন আদালত। আদালতের সেই রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শাহবাগ চত্বরে জড়ো হয়েছিল হাজার হাজার মানুষ।

যাই হোক, এ ধরনের প্রতিবাদ-বিক্ষোভের শেষ পরিণতি অনুমান করা যায় না। যেমন আগস্টের ৫ তারিখে শেখ হাসিনার বিদায়ের আগে পর্যন্ত তা অনুমান করা যায়নি। তবে সাম্প্রতিক এই বিক্ষোভের সঙ্গে ২০১১ সালের কায়রো বিক্ষোভের মিল রয়েছে। ওই বিক্ষোভের জেরে মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক ১১ ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করে সৌদি আরবে পালিয়ে যান।

কায়রো থেকে ঢাকা ঃ হোসনি মোবারক কায়রো ত্যাগ করার পর মিশরের দায়িত্ব নেয় দেশটির সেনাবাহিনী। কিন্তু কায়রোর তাহরির স্কয়ারে যারা বিক্ষোভ করেছিল, তারা চেয়েছিল, আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার প্রধান মোহাম্মদ এল বারাদি মিশরের দায়িত্ব নিন। এমন পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী একটি সংবিধান সভা আহ্বান করতে ২০১২ সালে নির্বাচন করতে বাধ্য হয়। ওই নির্বাচনে ক্ষমতায় আসে মিশরের সবচেয়ে সংগঠিত রাজনৈতিক দল মুসলিম ব্রাদারহুড। এর এক বছরের মাথায় ২০১৩ সালে ব্রাদারহুড সরকারকে উৎখাত করে সেনাবাহিনী। তারা এল বারাদিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়। কিন্তু তিনিও মাত্র জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত ওই পদে থাকতে পেরেছিলেন।

একচেটিয়া শাসনের বিরোধিতায়ও যে কারণে সতর্ক থাকা উচিত ঃ ওই সময়কালে মিশরের সামরিক বাহিনী সংবিধান স্থগিত করে এবং সেনাপ্রধান নিজের উর্দি খুলে সাধারণ স্যুট পরে নিজেই প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসেন। সেই উর্দি খোলা জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মিশরের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় রয়েছেন। তিনি তাহরির স্কয়ারে আন্দোলনকারী বেশির ভাগ নেতাকেই কারাবন্দী করেছেন। আন্দোলনকারী ওই প্রজন্ম এখন ভীষণ হতাশ।

বাংলাদেশে এল বারাদি হলেন নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি এরই মধ্যে সাবেক আমলা, শিক্ষাবিদ ও এনজিও খাতের উদারপন্থী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সরকার গঠন করেছেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহউদ্দিন আহমেদ। নয়া উদারতাবাদী অর্থনৈতিক নীতি প্রয়োগের ব্যাপারে তাঁর বিশেষ সুখ্যাতি রয়েছে। তিনি বিশ্বব্যাংকের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ও মিশরের নবনিযুক্ত অর্থমন্ত্রী আহমেদ কাউচউকের সঙ্গে বৈঠক ও অলোচনায় নিঃসন্দেহে

Scanned with OKEN Scanner

স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন।

বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এখনো ব্যারাকেই রয়েছে। কিন্তু দমন-পীড়নের সংস্কৃতি পাল্টায়নি, শুধু গ্রেপ্তারের ঠিকানা পাল্টেছে। ইউনূসের সরকার বিদায়ী শেখ হাসিনা সরকারের মন্ত্রী-এমপি ও অন্যান্য নেতাদের বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেপ্তার করছে। বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোতে প্রতিদিন বিভিন্ন অভিযোগে নতুন নতুন গ্রেপ্তারের খবর আসছে। শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগ ধ্বংসপ্রায়। তিনি নিজে কূটনৈতিক পাসপোর্টে ভ্রমণের অধিকার হারিয়েছেন। হত্যার অভিযোগ এনে সম্প্রতি ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেননকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এমনকি আওয়ামী লীগের এমপি ও ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান, যিনি এখন পাকিস্তানে বাংলাদেশের হয়ে ক্রিকেট খেলছেন, তাঁর বিরুদ্ধেও হত্যা মামলা করা হয়েছে।

ইউনূস সরকারকে যে ভুলগুলো এড়াতে হবে ঃ এসব মামলা শেষ পর্যন্ত টিকবে কি না, সেটি দেখার বিষয়। আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে, শুধু প্রতিশোধের উদ্দেশ্যেই শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ ও সংশ্লিষ্ট দলের সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এরই মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর পুনরুত্থান দেখা যাচ্ছে। জামায়াতেরই আরেক শাখা 'আমার বাংলাদেশ পার্টি,(এবি পার্টি)' রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন পেয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে এই পার্টির বেশ কয়েকজন নেতাকে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

ফলে সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে, বাংলা বসন্ত খুব দ্রুতই শীতের দিকে যাচ্ছে।

লেখক ইতিহাসবিদ, সম্পাদক এবং সাংবাদিক। গ্লোবট্রটার,এর রাইটিং ফেলো এবং প্রধান সংবাদদাতা। একই সঙ্গে তিনি লেফট ওয়ার্ড বুকস,এর সম্পাদক এবং ট্রাইকন্টিনেন্টাল ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল রিসার্চের পরিচালক। -নিবন্ধটি পিপলস ডিসপ্যাচ থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে অনূদিত এবং সংক্ষেপিত।

স্ফুলিঙ্গের সন্ধানে এক বিজ্ঞানী

সিদ্ধার্থ সেন

নাম ঃ হারমান জোসেফ মুলার

জন্ম ঃ ১৮৯০ সাল, আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে

সর্বোচ্চ ডিগ্রি ঃ নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণীতত্ত্বে পি এইচ ডি (১৯১৬)

পেশা ঃ শিক্ষকতা ও গবেষণা; আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, রাশিয়া ইত্যাদি নানা দেশে

সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্তি ঃ নোবেল পুরস্কার (১৯৪৬) শারীরতত্ত্ব ও চিকিৎসাশাস্ত্রে, এক্স রে দিয়ে জিন মিউটেশন উপরে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার জন্য

মৃত্যু ঃ ১৯৬৭ সাল, আমেরিকার ব্লুমিংটন শহরে।

সাধারণত অন্য পাঁচজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সংক্ষিপ্ত জীবনী পেলে উপরের এতটুকু কথাতেই আমাদের কৌতূহলে ছেদ পড়ে। তার প্রতি সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে যাই; হাজার হলেও প্রতি বছর অন্তত দশ জন করে নোবেল পুরস্কার পেয়ে যাচ্ছেন। সবার কথা কারই বা মনে থাকে? আর ইনি তো পেয়েছেন প্রায় আশি বছর আগে! এই লেখাটিরও প্রয়োজন পড়তো না, যদি না এই বিজ্ঞানীর সমন্ধে এর বাইরেও বিশেষ করে কিছু বলার না থাকতো। তৎকালীন সমাজের সমস্ত রকমের শোষণ, বর্ণ বৈষম্যর বিরুদ্ধে সরব হয়ে ও বিজ্ঞানের সাথে অপবিজ্ঞান মেশানোর প্রতিবাদে ও সমাজ পরিবর্তনের সপক্ষে বারবার নিজের জীবন বিপন্ন করে লড়াই করে গেছেন। বিজ্ঞান ও সমাজবোধকে তিনি অবিচ্ছেদ্য ভাবে দেখেছিলেন। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রতি তাঁর অনুরাগের কারণে তাঁকে বারবার নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে পড়তে হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব মতামত তিনি সর্বত্র বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন, এ নিয়ে কোনো আপস করেন নি। সে খবর সংক্ষেপে বলার জন্যই এই প্রচেষ্টা।

প্রাককথন ঃ মুলারের কর্মজীবন সমন্ধে বলার আগে বরং সেই সময়কার বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক পরিস্থিতির একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া যাক। ১৮৫৯ সালে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবজগতের বিকাশ নিয়ে বইটি প্রকাশের সাথে সাথে প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক বিরাট আলোড়ন ওঠে। এই ডারউইনের তত্ত্ব জীবজগতের বিবর্তনের উপরে একটা বৈজ্ঞানিক রূপরেখা প্রতিষ্ঠিত করে। সেই সাথে বিজ্ঞানীরা অনুমান করতে থাকেন যে, বাবা-মা থেকে তার সন্তান সন্ততিদের মধ্যে তাদের চেহারা, গায়ের রং, ইত্যাদি ব্যাপারে নানা তথ্য বংশানুক্রমিকভাবে পরিবাহিত হয়। সেটা ঠিক কিভাবে হয় তা নিয়ে তখন ধারণা না থাকলেও বিজ্ঞানীরা এটির নাম দিলেন জিন। এরই মধ্যে বর্তমান চেক রিপাবলিকের অন্তর্ভুক্ত ব্রুণ শহরে গ্রেগর মেন্ডেল নাম এক যাজক ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩ সাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে নীরবে মটরগাছের নানা প্রজাতির চাষ করে ও তাদের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গেলেন। বেশ কয়েক প্রজন্মের গাছগুলোর উপর পরীক্ষা করে তিনি এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে নানা তথ্য কিভাবে পরিবাহিত হয়, সে সম্পর্কে কিছু সূত্র বের করেন। মেন্ডেলের মূল্যবান এই গবেষণার খবর কিন্তু লোকচক্ষুর আড়ালেই থেকে যায়। তাঁর মৃত্যুর ষোল বছর পরে ১৯০০ সালে আকস্মিকভাবে এক তরুণ গবেষক উদ্ধার করলেন এই আবিষ্কার। দেখলেন, তিনি যা খুঁজছিলেন, তার উত্তর মেন্ডেল ৩৪ বছর আগেই দিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, এতদিন পরে ওই ধরনের পরীক্ষা আবার করে দেখলেন তার ফল মেন্ডেলের সাথে হুবহু মিলে গেল। সেই সাথে বংশধারা বজায় রাখার ব্যাপারে নতুন একটি গবেষণার বিষয়ের দরজা খুলে গেল, সেটি হল জিনতত্ত্ব।

সামাজিক ন্যায়ের পক্ষে ঃ খুব অল্প সময়ের মধ্যে জিনতত্ত্বের উপরে গবেষণা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়লো। ইউরোপের বাইরে

Scanned with OKEN Scanner

আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থমাস মরগ্যান ও তাঁর ছাত্ররা এক ধরণের ফলের মাছির উপরে নানারকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাঁদের পরীক্ষাগারটিকে জিনতত্ত্বের উপরে আমেরিকার সবচেয়ে নামী গবেষণাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে সুনাম অর্জন করলেন। হারমান মুলার তখন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। স্বভাবতঃই জিনতত্ত্বের উপর গবেষণা করার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে টেনে নিয়ে গেল এর উপরে পি এইচ ডি করতে। অবশেষে ১৯১৬ সালে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করলেন। এর পরে তিনি প্রথমে টেক্সাসের রাইস ইনস্টিটিউট ও পরে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ও স্বাধীনভাবে গবেষণা ও শিক্ষকতা শুরু করেন। তারপর থেকে দীর্ঘদিন এই দুই জায়গায় মুলার নানা গবেষণা করে খ্যাতি লাভ করেন। এর মধ্যে পরীক্ষাগারে এক্স রে প্রয়োগ করে জিনের পরিবর্তন ঘটানো তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা।

নিউ ইয়র্কের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে মুলার বড় হয়েছেন। তাঁর পরিবার অনেক আগে থেকেই তৎকালীন শ্রমিক ও সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের প্রতি অনুরক্ত ছিল। এর প্রভাব মুলারের জীবনেও গভীরভাবে ছাপ ফেলে। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন ওখানকার ছাত্রদের সংগঠন ন্যাশনাল স্টুডেন্টস লীগের উপদেষ্টা ছিলেন তিনি। মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর এফ বি আই এটি ভালো চোখে দেখেনি। তাদের কাছে এটি ছিল কমিউনিস্টদের ছাত্র সংগঠন। এ ছাড়াও এই সময়ে তিনি একটি গুপ্ত পত্রিকা স্পার্ক-এর সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটি সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রচার ছাড়াও আমেরিকার কালো মানুষ ও নারীর সমান অধিকার, বেকার ও দরিদ্র মানুষের জন্য নানা সামাজিক সুবিধার দাবিতে আন্দোলনের জন্য এক বড় প্রচার মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। মনে রাখতে হবে, তখন সদ্য রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে ও লেনিনের নেতৃত্বে এক নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বিপ্লবের আগে লেনিন যে পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন তার নাম ছিল ইস্ক্রা, বাংলায় স্ফুলিঙ্গ। অনুমান করা যায় সেই আদর্শ নিয়েই মুলার সম্পাদিত স্পার্ক পত্রিকাটি বের করা হচ্ছিল। এর সাথে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির গোপন সম্পর্ক ছিল। মতাদর্শগত মিল থাকলেও মুলার সেই দলে যোগ দেন নি। তবে এর ফলে মুলারকে নানাভাবে হেনস্থা হতে হয়।

অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ঃ ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্ব ও মেন্ডেলের জিনের সূত্রাবলি প্রকাশিত হবার পরে বৈজ্ঞানিক মহলে এক বিরাট আলোড়ন পড়ে। অনেক বিজ্ঞানীই এব্যাপারে কাজ আরো এগিয়ে নেবার জন্য তৎপর হন। কিন্তু সেইসাথে বিবর্তনের খোলসে চুপি চুপি নানা রকমের অপবিজ্ঞানও আশ্রয় নেয়। এর মূল হোতা ছিলেন ব্রিটেনের ফ্রান্সিস গ্যালটন, যিনি আবার সম্পর্কে ডারউইনের তুতোভাই ছিলেন। এই গ্যালটন বিবর্তনবাদের এক শাখা হিসেবে এক নতুন তত্ত্ব প্রস্তাব করেন। সেটি হলো ইউজেনিক্স (Eugenics) বাংলায় শব্দার্থ করলে মানে দাঁড়ায়; সুপ্রজননবিদ্যা। অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচনের সূত্র ধরে আমরা যদি মানুষের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত প্রজনন ঘটাতে পারি, যাতে একমাত্র শক্তিমান ও বুদ্ধিমান মানুষেরই বংশ বৃদ্ধি হবে, তাহলে আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা আরো উন্নত মানুষ রেখে যেতে পারব। আর সেই সাথে যারা রুগ্ন, বিকলাঙ্গ, জড় মস্তিষ্কের মানুষ, তাদেরকে নির্বীজকরণ করা হোক, এই নিকৃষ্ট প্রজাতির মানুষের যাতে কোনো বংশবৃদ্ধি না হয়।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই তত্ত্ব বেশ জনপ্রিয়তা পেয়ে গেল। মনে রাখতে হবে, গোটা পৃথিবী জুড়ে তখন সাদাদের রাজত্ব। কালো ও মিশ্র গায়ের রং যাদের, তাদেরকে এক নিকৃষ্ট মনুষ্য প্রজাতি বলেই গণ্য করা হতো। গোটা আমেরিকা ও ইউরোপ বর্ণ বিদ্বেষ তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে চলছে। এই মতবাদ বর্ণবিদ্বেষের পক্ষে এক বিরাট মতাদর্শগত হাতিয়ার এনে দিল। আমেরিকার আইন ব্যবস্থাও এই সুপ্রজনন তত্ত্ব সমর্থন করল। এর চূড়ান্ত ফল হল, ১৯২৭ সালে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট যখন এক বিকলাঙ্গ ও জড় মস্তিস্ক মা, নাম এমা বাক, তার আপাতঃ সুস্থ সন্তান ক্যারি বাক কে বন্ধ্যাকরণের নির্দেশ দিল ও তা অবিলম্বে কার্যকর করা হল। বর্ণবিদ্বেষীরা এতে সন্তুষ্ট হল বটে, কিন্তু এ থেকে উৎসাহ নিয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেল জার্মানিতে হিটলারের নাৎসি বাহিনী। ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় আসার পরে পরবর্তী এক দশকের বেশি সময়ে এই যুক্তি দেখিয়ে আর্য রক্ত দূষণ মুক্ত করতে ধাপে ধাপে তারা বিভিন্ন জায়গায় গ্যাস চেম্বার তৈরি করে তাতে ইহুদি, জিপসি, পোলিশ ও রাজনৈতিক বন্দিদের জড়ো করে নির্মমভাবে হত্যা করতে থাকল, মোট মৃতের সংখ্যা এগারো লক্ষের উপর। ইউরোপ, আমেরিকার ইউজেনিক্সের সমর্থকরাও এতে ভয় পেয়ে গেলেন। এর মধ্যে জীন নিয়ে গবেষণা অনেক দূর এগিয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল ইউজেনিক্স এর পক্ষে গেল না, বরং দেখা গেল আপাতঃ সুস্থ মা-বাবার সন্তান বিকলাঙ্গ ও জড়বুদ্ধির হতে পারে। আবার বিকলাঙ্গ বাবা-মার সন্তানও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে জন্মাতে পারে। এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। এই সাথে ইউজেনিক্সের মতের বিরুদ্ধে আর একটি মতবাদ প্রবল ভাবে আসতে লাগলো। সেটি হল ইউথেনিক্স (Euthenics)। এই মতবাদের প্রবক্তাদের বক্তব্য হল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উন্নতি আনতে পারলেই মানুষ্য প্রজাতির উন্নতি হতে পারে। এই সমস্ত সুযোগসুবিধা সবাই সমানভাবে পেলেই কার জিন বেশি উন্নত, এই জাতীয় তুলনা করা চলে, না হলে নয়।

বলা বাহুল্য মুলার এই বর্ণবৈষম্যবাদী মতবাদের বিরোধী ছিলেন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই মানুষের জীবনের উন্নতির পক্ষে ছিলেন। শুধু তাই নয় বিভিন্ন বিজ্ঞানসভায়

Scanned with OKEN Scanner

এব্যাপারে তাঁর মতামত স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করে যেতে লাগলেন। ১৯৩২ সালে এক বিজ্ঞান সভায় তিনি জোর গলায় বললেন, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশে, যেখানে শিশু, পুরুষ, নারী, সাদা ও কালো মানুষের শিক্ষা, বাসস্থান ও অন্যান্য সামাজিক সুবিধাগুলি সমান ভাবে পাওয়া যাবে, সেখানেই এই সুপ্রজননবিদ্যার চর্চা হতে পারে, অন্য খানে নয়।

স্বাভাবিকভাবে এর ফল মুলারের পক্ষে ভাল হল না। মার্কিন সরকার তাঁর খোলাখুলিভাবে সমাজতন্ত্রের সমর্থনে বক্তব্য ভালো ভাবে নেয় নি। কমিউনিস্ট মতাবলম্বী গুপ্ত পত্রিকার সম্পাদনা করার দোষে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিও তখন চলে যাবার উপক্রম। উপায় না দেখে মুলার দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কোথায় যাবেন ? জার্মানি, কারণ জার্মানিতেই তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের তখন সমাবেশ। সময়টা ১৯৩২ সাল।

দেশে দেশে ঃ কিন্তু সময়টা বাছতে ভুল হয়েছিল। পরের বছরই হিটলার ক্ষমতায় আসে। বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞানীদের উপরে খাঁড়া নামতে শুরু করে। আইনস্টাইন সহ বিভিন্ন নামি দামি বিজ্ঞানী দেশত্যাগ করে অন্য দেশে আশ্রয় নিতে শুরু করলেন। মুলারের কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রতি আনুগত্যের খবর নাৎসিদের কাছে পৌঁছে যাওয়াতে, তিনি অচিরেই বুঝতে পারলেন জার্মানিতে থাকা তাঁর পক্ষে আর নিরাপদ নয়। রুশ কৃষিবিজ্ঞানী ভাভিলভের কাছ থেকে এক আমন্ত্রণ পেয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি রাশিয়ায় এলেন ও লেনিনগ্রাদে জীন গবেষণার উপরে এক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই সময় তাঁর মনে হয়েছিল জীন বিজ্ঞানের উপরে গবেষণার জন্য সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার চাইতে ভালো জায়গা আর হতে পারে না। ছয় বছর তিনি রাশিয়ায় ছিলেন, প্রথমে লেনিনগ্রাদে, ও পরে মস্কোর এক গবেষণাগারে, সেটিও তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু এর মধ্যে রাশিয়ার পরিস্থিতিও পাল্টাতে শুরু করলো। নতুন এক ক্ষমতাবান ব্যক্তির উত্থান হতে লাগলো, নাম তার লাইশেঙ্কো । তিনি বিজ্ঞানী বলে নিজেকে দাবি করতেন, যদিও এব্যাপারে তাঁর দক্ষতা নিয়ে অনেকেই সন্দিহান ছিলেন। তিনি জিনতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর দাবি, শস্যবীজকে যদি খুব ঠান্ডায় কিছুদিন রাখা যায়, তবে তার মধ্যে জিনের সমস্ত তথ্য, যা বংশ পরম্পরায় সঞ্চালিত হয়, তা সম্পূর্ণ মুছে ফেলা যায়। এইভাবে নিচু জাতের বীজ দিয়েও ফলন অনেকগুন বাড়ানো সম্ভব। ওঁর দাবি, শস্যবীজ নিয়ে রীতিমত পরীক্ষা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কিন্তু ভাভিলভের মত জিনতত্ত্বের সমর্থক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষার ফলের সত্যতা সমন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এই নিয়ে ভাভিলভের সাথে লাইসেঙ্কোর প্রকাশ্যে বিবাদও সামনে আসে। কিন্তু তৎকালীন শাসক কমিউনিস্ট পার্টি এই বিতর্কে পুরোপুরি লাইশেঙ্কোর পিছনে দাঁড়ায়। অসম্ভব ক্ষমতাধারী হয়ে ওঠেন লাইশেঙ্কো। পরবর্তীকালে ১৯৪০ সালে তিনি রাশিয়ান একাডেমী অফ সায়েন্সের ইনস্টিটিউট অফ জেনেটিক্সের অধিকর্তা হন। সেই সাথে মেন্ডেলীয় জিনতত্ত্ব বর্জন করে তাঁর নিজের তত্ত্ব গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে থাকেন। এইভাবে রাশিয়ায় সেই আমলের প্রতিষ্ঠিত জিন গবেষণাগারগুলিতে মেন্ডেলীয় বংশপরম্পরার গবেষণা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন রাশিয়ার দোরগোড়ায়। সর্বত্রই তখন সন্দেহের ধুম্রজাল। এই অবকাশে লাইশেঙ্কো তাঁর বিরুদ্ধমতের বিজ্ঞানীদের নানা ছুতোয় গ্রেফতার করে হয় সাইবেরিয়া পাচার করান, নতুবা তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

এদিকে মুলার নতুন সমাজতান্ত্রিক পরিমন্ডলে বাধাহীন ভাবে জিনের গবেষণা করবেন বলে ১৯৩২ সালে সোভিয়েত রাশিয়া এলেন। প্রথম কয়েক বছর লেনিনগ্রাদ ও মস্কোতে জীন গবেষণাগার গড়ে তোলার জন্য সরকার থেকে যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য পেলেন। কিন্তু এরই মধ্যে লাইশেঙ্কোর উত্থান হলো। তাঁর মতবাদকে মুলার সরাসরি ভ্রান্ত বলে তিনি আখ্যা দিলেন এবং প্রকাশ্যে লাইশেঙ্কোর সাথে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। এছাড়াও তিনি ইউজেনিক্সের উপরে তাঁর মতামত ও এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুযোগ নিয়ে একটি বইয়ের খসড়া লেখেন এই সময়ে। বন্ধুদের পরামর্শে স্টালিনকে তিনি খসড়াটি পাঠিয়ে তাঁর মতামত চান। কোনো উত্তর তিনি পান নি, কিন্তু আন্দাজ করলেন কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর বক্তব্য ও ভবিষ্যৎ গবেষণার কর্মসূচি ভালো চোখে দেখছে না। মুলার ক্রমশঃ বুঝতে পারলেন তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ায় তাঁর উপস্থিতি আর কাঙ্ক্ষিত নয়। কিন্তু কোথায় যাবেন তিনি? এতো দেশ থেকে তাড়া তিনি তাঁর স্বপ্নের দেশ রাশিয়ায় এসেছেন। সেখান থেকে আবার যাবেন কোথায়? সময়টা ১৯৩৬ সাল।

সুযোগ একটা মিলে গেল বটে। ১৯৩৬ সালে স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। তৎকালীন ক্ষমতাশীল উদারপন্থী ও কমিউনিস্ট সমর্থিত রিপাবলিকান সরকারকে উৎখাতের জন্য মিলিটারি ও রক্ষণশীল গোষ্ঠীর সমর্থিত জাতীয়তাবাদী দল যুদ্ধ ঘোষণা করে। এদের পিছনে ইতালি ও জার্মানির ফ্যাসিস্ট শক্তির সাহায্য ও সমর্থন ছিল। অপরদিকে রিপাবলিকানদের সমর্থনে সারা বিশ্বের যুব সম্প্রদায়, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক এগিয়ে আসে, গঠিত হয় আন্তর্জাতিক ব্রিগেড। তারা রিপাবলিকানদের সাথে হাতে হাত রেখে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে চলে আসে। মুলারও ১৯৩৬এর শেষে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের একজন স্বেচ্ছাসেবক হয়ে স্পেনের যুদ্ধে যোগ দিতে অনুমতি পেয়ে যান। তিনি যোগ দেন কানাডীয় ডাক্তার নরমান বেথুনের চিকিৎসাকারী দলে। তাঁর কাজ ছিল

Scanned with OKEN Scanner

যুদ্ধে আহত রোগীদের রক্ত দেবার সময় তাদের শারীরবৃত্তের কার্য্যকারিতা দেখভাল করা।

কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই যুদ্ধে রিপাব্লিকান আর্মি পিছিয়ে পড়তে থাকলো। ফ্রাঙ্কোর নাৎসি বাহিনী মাদ্রিদ শহর প্রায় অবরুদ্ধ করে রাখল। পরাজয় প্রায় নিশ্চিত জেনে ১৯৩৭ সালে মুলার এবার ভাবলেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এবার ফেরা যাক। কিন্তু যাবেন কোথায়? রাশিয়া ফেরার দরজা বন্ধ। নিজের দেশ আমেরিকা গেলে তাঁর হাজতবাস নিশ্চিত। এরই মধ্যে একটা সুযোগ এসে গেল। এক সহকর্মীর মাধ্যমে ব্রিটেনের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অতিথি অধ্যাপকের কাজ জুটল। মুলার ওখানেই যোগ দিলেন এবং দ্রুত নতুন জায়গায় শিক্ষকতা ও গবেষণায় মন দিলেন। এই সময়ে তাঁর গবেষক ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এক ভারতীয়, শচী প্রসাদ রায় চৌধুরী, যিনি পরে দেশে ফিরে এসে প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। কিন্তু মুলারের এখানকার চাকরিও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানিয়ে দেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আর্থিক সংকটে বিদেশী কোনো অতিথি অধ্যাপককে বেতন দেওয়ার সঙ্গতি তাদের নেই। মুলার যেন নিজের পথ নিজে খুঁজে নেন।

প্রত্যাবর্তনঃ উপায়ান্তর না দেখে মুলার ফিরে এলেন নিজের দেশ আমেরিকায়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হল না বটে, তবে চাকরি পাওয়া একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। অনেক কষ্টে আমহার্স্ট কলেজে একটি অস্থায়ী চাকরি পেলেন বটে, কিন্তু তাতে গবেষণা করার সুযোগ নেই। দীর্ঘ পাঁচ বছর অপেক্ষা করার পর, অবশেষে তাঁর অনিশ্চয়তা ঘুচলো। ১৯৪৫ সালে তিনি ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়, ব্লুমিংটনে একটি পাকা চাকুরীতে যোগ দিলেন। আর ১৯৪৬ সালে তাঁর জুটলো নোবেল পুরস্কার।

এরপর থেকে মৃত্যু অবধি বাকি জীবনে মুলারের যশ, খ্যাতি, প্রশংসা, কোনো কিছুরই অভাব হয়নি। কিন্তু সোজাসাপ্টা কথা বলা ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসের কোনো বিরাম পড়েনি। বাকি জীবন তিনি ঠান্ডা যুদ্ধের বিরুদ্ধে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বিপদ সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করতে ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য বার বার সরব হয়েছেন। ১৯৫৭ সালে তিনি মার্কিন মানবতাবাদী সংগঠনের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন। এই রকম এক আপোষহীন লড়াকু ও সমাজসচেতন বিজ্ঞানী আজকের দিনে বিরল।

লেখক অবসরপ্রাপ্ত ডিন, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, খড়গপুর।

আরজি কর কাণ্ড অভূতপূর্ব ঘটনায় নজিরহীন প্রতিক্রিয়া

মজিবুর রহমান

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল বাংলা তথা ভারতের একটি প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান। কলকাতায় এটার প্রথম পথচলা শুরু হয় ১৮৮৬ সালে। একটা সংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা পায় ১৯১৬ সালে। খ্যাতনামা চিকিৎসক তথা প্রতিষ্ঠাতা সচিব রাধাগোবিন্দ করের (১৮৫২-১৯১৮) নামানুসারে বর্তমান নামকরণে পরিচিত হচ্ছে ১৯৪৮ সাল থেকে। এখানকার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আসন সংখ্যা হল যথাক্রমে ২৫০ ও ১৭৫। সিনিয়র ও জুনিয়র মিলিয়ে মোট চিকিৎসক সংখ্যা ৭০০। শয্যা সংখ্যা দেড় হাজার।

৯ই আগস্ট, ২০২৪ সকালে দ্বিতীয় বর্ষের স্নাতকোত্তর শিক্ষানবিশ (পিজিটি) একজন মহিলাকে (৩১) আর জি করের একটি সেমিনার কক্ষে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ওই তরুণী চিকিৎসক টানা ৩৬ ঘণ্টা ডিউটিতে ছিলেন। তিনি ৮ই আগস্ট দিবাগত রাত্রে নৈশভোজ সেরে একটু ঘুমোচ্ছিলেন। সেই সময় তিনি নৃশংস নির্যাতনের শিকার হন। তাঁর শরীরে গুরুতর আঘাত ও ধর্ষণের চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথমে এটিকে আত্মহত্যার ঘটনা বলা হয়। কিন্তু জুনিয়র ডাক্তাররা সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং এবং যথাযথ তদন্তের দাবি জানাতে থাকেন। ময়না তদন্তের ভিডিওগ্রাফি করা হয়। মৃতার বাবা-মাকে অবশ্য ঠিকমতো দেহ দেখতে দেওয়া হয়নি। তাড়াহুড়ো করে শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মধ্যে কার্যত কর্তব্যরত অবস্থায় একজন তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনা ভূ-ভারতে আর কখনও ঘটেছে বলে মনে হয় না। এই অভূতপূর্ব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তাও নজিরবিহীন। এই জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ প্রতিবাদ কর্মসূচি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মাসাধিককাল ধরে সংঘটিত হয়েছে তা এই বঙ্গে স্মরণাতীত কালের দেখা যায়নি।আট থেকে আশি সকলেই সোচ্চার। শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, সাংস্কৃতিককর্মী, যৌনকর্মী, ক্রীড়ামোদী, আইনজীবী, চিকিৎসক, তৃতীয় লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী, ছাত্র, যুব প্রায় সব পেশার মানুষ ও পেশাগত সংগঠনকে নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে একাধিকবার মিছিলে ও সমাবেশে সামিল হতে দেখা গেছে।জীবনে প্রথমবার প্রতিবাদ জানাতে পথে নেমেছেন এমন মানুষের সংখ্যাও অজস্র। পশ্চিমবঙ্গে বোধহয় এতবড় নাগরিক তথা অরাজনৈতিক আন্দোলন আর কখনও গড়ে ওঠেনি।গণ আন্দোলনের ইতিহাসে সংযুক্ত হয়েছে নতুন ধারা-

Scanned with OKEN Scanner

মেয়েদের রাত দখল। একটি উচ্চমানের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে একজন চিকিৎসকের যৌন নিপীড়ন ও হত্যার ঘটনা যে যত্রতত্র ঘটে চলা আর পাঁচটা ধর্ষণ-খুনের ঘটনার থেকে অনেকটাই আলাদা গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে, এটা সকলেরই উপলব্ধির মধ্যে এসেছে। এজন্য রাজ্য ও দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বময় ধ্বনিত হয়েছে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস', 'জাস্টিস ফর আর জি কর', 'জাস্টিস ফর তিলোত্তমা' প্রভৃতি স্লোগান।

আর জি করের মহিলা ডাক্তারের ধর্ষণ ও খুন আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা বলে মনে হয় না। এটা পরিকল্পনা করেই করা হয়েছে। এই পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনায় ওই স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ও চিকিৎসকের জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। 'তিলোত্তমা' হয়তো কারোর সঙ্গে কোনো সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কোনো গুরুতর গোপন বিষয় হয়তো তিনি জেনে ফেলেছিলেন। তাঁর ভূমিকায় কেউ হয়তো ভীষণ অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েছিল।তাই তাঁকে প্রাণে মারার ষড়যন্ত্র করা হয়, সঙ্গে যৌন নির্যাতন। এখানে ক্রোধ মুখ্য, কাম গৌণ। এই ভয়ঙ্কর ঘটনা যাতে নির্বিঘ্নে ঘটতে পারে তার বন্দোবস্ত আগে থেকেই করা হয়। তিলোত্তমাকে কে বা কারা খুন ও ধর্ষণ করেছে, এই তথ্য উদঘাটন করার পাশাপাশি কে বা কারা তা করিয়েছে, সেই তথ্যও সামনে আসা জরুরি।

আর জি করের ঘটনায় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি ও লবিবাজির খবর প্রকাশ পেয়েছে। পড়ুয়াদের রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার রেজাল্ট, ওষুধপত্র, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয়, বিভিন্ন পদে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি সবেতেই অনিয়ম, কাটমানি, কমিশন ও কারচুপির ঘটনা ঘটে। মেডিক্যাল কলেজের পড়াশোনা ও প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক ও কর্তাব্যক্তিদের অনেকেই যে এক একটা দুর্বৃত্ত হয়ে উঠেছেন, একথা এতদিন সাধারণ বঙ্গবাসী জানত না। পাড়ার মাথামোটা মাস্তানদের মতো স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে অবস্থানকারী মেধাবী ডাক্তাররাও যে দাদাগিরি করেন, ভাবতেই খারাপ লাগছে। থ্রেট কালচার, মাফিয়ারাজ ছড়িয়ে পড়তে কোনো ক্ষেত্রই বোধহয় বাকি নেই। পশ্চিমবঙ্গের শুধু পশ্চাদগমন চলছে।

আর জি করের মহিলা ডাক্তারের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রেক্ষাপটে ধর্ষণ ও অন্যান্য যৌন অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে শেষ করে দোষীদের মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি কার্যকর করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দুদিনের (২-৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪) বিশেষ অধিবেশনে অপরাজিতা নারী ও শিশু (পশ্চিমবঙ্গ ফৌজদারি আইন ও সংশোধন), ২০২৪ বিল সর্বসম্মতিক্রমে ধ্বনিভোটে পাস হয়েছে। রাজ্যপাল বিলটিতে স্বাক্ষর না করে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেছেন। কিন্তু বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভে সমর্থ হবে বলে মনে হয় না। প্রথমত, ধর্ষণের কড়া শাস্তি আগেকার আইপিসি অথবা এখনকার বিএনএস-এ নেই এমনতো নয়। ধর্ষণ ও খুনের শাস্তি হিসেবে ২০০৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় ও ২০২০ সালে দিল্লীতে মুকেশ সিং, পবন গুপ্তা, বিনয় শর্মা ও অক্ষয় কুমারের ফাঁসি হয়। আর জি করের তিলোত্তমার ধর্ষক ও খুনীদের ক্ষেত্রেও মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি প্রযুক্ত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, কোনো অপরাধের এক ও একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করা আমাদের সংবিধানের পরিপন্থী। প্রতিটি অপরাধের সাজার ক্ষেত্রেই বিকল্প সংস্থান থাকা জরুরি। আদালত একাধিক বিকল্প থেকে যেকোনো একটিকে বেছে নেবে। কাজেই ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব দেখানোর নামে রাজ্য সরকারের তাড়াহুড়ো করে নতুন আইন তৈরির উদ্যোগের মধ্যে নাটকীয়তা থাকলেও এটি কোনো কাজের কাজ নয়। নিছকই আই ওয়াশ।

যখন 'বিচার চাই', 'জাস্টিস চাই' বা 'ইনসাফ চাই' বলে আওয়াজ ওঠে তখন আসলে চাওয়া হয়, যেন বিচার প্রক্রিয়া যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে শেষ করে অপরাধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলের শাস্তি কার্যকর করা হয়। এটা অত্যন্ত জনপ্রিয় দাবি। কিন্তু ভারতীয় বিচারব্যবস্থা এব্যাপারে ডাহা ফেল। স্বাধীন ভারতে একাধিক আইন কমিশন গঠন, ফৌজদারি আইনের সংস্কার ও সংশোধনী সত্ত্বেও এব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি। বিচার প্রক্রিয়া শেষ হতেই চায় না! ফলতঃ সাজা ঘোষণা ও তা কার্যকর করতে সাঙ্ঘাতিক বিলম্ব ঘটে। পয়লা জুলাই, ২০২৪ প্রবর্তিত নতুন ফৌজদারি আইনও বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা দূরীকরণে কোনো কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবে বলে মনে হয় না। এতে প্রথম শুনানির ৬০ দিনের মধ্যে চার্জ গঠন এবং শেষ শুনানির ৪৫ দিনের মধ্যে রায় ঘোষণা করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শুনানির সর্বোচ্চ সংখ্যা কিংবা প্রথম ও শেষ শুনানির মধ্যে সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবধানের ব্যাপারে নির্দিষ্ট ভাবে কিছু বলা হয়নি। অর্থাৎ, 'তারিখ পে তারিখ' চলতেই থাকবে আর আমাদের আওড়াতে হবে- জাস্টিস ডিলেইড ইজ জাস্টিস ডিনাইড। খুনের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে অনেক বিলম্ব ঘটার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। মহাত্মা গান্ধী নিহত হন ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি। ঘাতক নাথুরাম গডসে হাতেনাতে ধরা পড়ে। নাথুরাম ও তার সহযোগী নারায়ণ আপ্তেকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় জাতির জনকের অভাবনীয় হত্যাকাণ্ডের ৬৫৫ দিন পর ১৯৪৯ সালের ১৫ই নভেম্বর। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর দেহরক্ষীদের গুলিতে নিহত হন ১৯৮৪ সালের ৩১শে অক্টোবর। সৎবন্ত সিং ও কেহর সিংয়ের ফাঁসি কার্যকর হয় প্রায় পাঁচ বছর পর ১৯৮৯ সালের ৬ই জুন। ২০০৮ সালের ২৬শে নভেম্বর মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ১৬৬ জন মানুষ মারা যায়।ধরা পড়ে পাকিস্তানী জঙ্গি আজমল কাশভ। তাকে ফাঁসি দেওয়া হয় চার বছর পর ২০১২

Scanned with OKEN Scanner

সালের ২১শে নভেম্বর। কলকাতার একটি আবাসনে ১৪ বছর বয়সী হেতাল পারেখের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটে ৫.৩.১৯৯০ তারিখ আর অভিযুক্ত ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় প্রায় দেড় দশক পর ১৪.৮.২০০৪ তারিখ। দিল্লিতে ২৩ বয়সী ফিজিওথেরাপি ছাত্রী 'নির্ভয়া'র (জ্যোতি সিং) গণধর্ষণ ও মৃত্যুর ঘটনা ঘটে ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত চারজনের ফাঁসি কার্যকর হয় সাত বছর পর ২০২০ সালের ২০শে মার্চ। অন্য একজন অপরাধের দিন বয়সের দিক থেকে নাবালক ছিল বলে ছাড়া পেয়ে যায়।

প্রাথমিক ভাবে ধর্ষণ ও হত্যা সংক্রান্ত অপরাধের বিচার হয় সেশন কোর্টে। সাধারণত সেশন কোর্ট রায় দিতে সময় নেয় এক থেকে দুই বছর। মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল মামলা করা হয় প্রথমে হাইকোর্টে এবং তারপর সুপ্রিম কোর্টে। শুনানি শেষ করে রায় দিতে বিরক্তিকর রকমের বিলম্ব ঘটে এই দুই আদালতে।সবশেষে রাষ্ট্রপতির কাছেও কিছুদিন প্রাণভিক্ষার আবেদন জমা পড়ে থাকে। এখন ভারতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা পাঁচ শতাধিক।বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরই বিচার প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে শেষ করার ব্যাপারে সচেষ্ট বা সিরিয়াস নয়। কাজেই পাবলিক চাইলেও তিলোত্তমার বিষয় বিস্মৃত হওয়ার আগে বিচার পাওয়ার সম্ভাবনা কম। ধারণা বা পারসেপশানের ভিত্তিতে বিচার প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় না। 'অন্ধা কানুন' যথেষ্ট পরিমাণে সাক্ষ্য, তথ্য ও প্রমাণ না পেলে কোনো অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে না। যে অপরাধে শাস্তি যত কড়া সেই অপরাধে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য সাক্ষ্য, তথ্য ও প্রমাণ তত শক্তপোক্ত হতে হয়। আর জি কর-এ তিলোত্তমার ঘটনায় তথ্য, প্রমাণ নষ্ট, বিকৃত ও লোপাট করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই'কে পারিপার্শ্বিক প্রমাণ (সারকামসটানশিয়াল এভিডেন্স) সংগ্রহের ওপর জোর দিতে হবে। তা করা না হলে বিরলের মধ্যে বিরলতম অপরাধের ঘটনাতেও কেউ শাস্তি পাবে না যা অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। সম্ভ্রান্ত পেশার একজন উচ্চশিক্ষিত মহিলা একটা মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় ধর্ষণ ও খুনের শিকার হওয়ার পরও বিচারব্যবস্থা অপরাধীদের শনাক্ত ও শাস্তি দিতে ব্যর্থ হলে সমাজে নারী সুরক্ষার প্রশ্নে অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

জুনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলন পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁরা তাঁদের আন্দোলনের অরাজনৈতিক চরিত্র বজায় রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের আন্দোলনের প্রতি 'সংহতি' জানাতে আসা সাংসদ, বিধায়ককে গো ব্যাক স্লোগান শুনিয়ে যেভাবে বিদেয় করেছেন তা সত্যিই সাহসী সিদ্ধান্ত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার গত তেরো বছরে আর কোনো আন্দোলনকে এতটা গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়নি। ডাক্তারদের দাবি মেনে একগুচ্ছ পুলিশ ও স্বাস্থ্য আধিকারিককে অপসারণ করা হয়েছে। আর জি কর কাণ্ডের প্রেক্ষাপটে রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্নীতি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সামগ্রিক বেহাল অবস্থা নিয়েই চিকিৎসকরা সরব হয়েছেন। এজন্য স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সংস্কার সাধনে এই আন্দোলনের একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিলোত্তমার নির্মম পরিণতির জন্য দায়ী সকল ব্যক্তির শাস্তি এবং সুস্থ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, এই মুহূর্তে নাগরিক সমাজের বলিষ্ঠ দাবি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার পরিবর্তন করার জন্য নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় কিন্তু অনাচার অসহনীয় হয়ে উঠলে সরকারকে পদক্ষেপ করতে বাধ্য করার জন্য যেকোনো সময়েই গণ আন্দোলন সংঘটিত হতে পারে।

(লেখক মুর্শিদাবাদ জেলার কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক।)

ভিয়েতনামের ডায়েরি

সৌর বসু

প্রথম পর্ব

৫ সেপ্টেম্বরঃ

আজ ভিয়েতনামের পথে রওনা হলাম। আমাদের উড়ান রাত্রি ০৯.৫০ মিনিটে। আমরা শান্তি নিকেতন থেকে বেলা বারোটা নাগাদ রওনা হয়ে পাঁচটার মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছি। এখনো দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। এত আগে পৌঁছে, এয়ারপোর্টে ঢুকতে পারবো কিনা ভাবছিলাম। ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত এক নম্বর গেট দিয়ে ঢোকার অনুমতি পেলাম। একটা ভালো জায়গা দেখে বসলাম । এবার ধৈর্যের পরীক্ষা। এখান থেকে হ্যানয় উড়ে যেতে দু'ঘণ্টা ৫০ মিনিট লাগবে। আমরা হ্যানয়ে রাত দুটো নাগাদ পৌছাবো।

ঘন্টাখানেক বসার পরে বেশ খিদে পেয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূর গিয়ে দেখি wow মোমোর দোকান। মোমো অর্ডার দিলাম। আমাকে বসতে বলল। মোমোর পাশেই ওয়াইন শপ। সেখানে অনেকে বসে বিয়ার পান করছে। প্রায় কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করার পর মোমো এল। বসার জায়গায় ফিরে দেখি সুতপা আমাদের ব্যাগটা রিপেয়ার করাচ্ছে। ব্যাগটার হ্যান্ডেল ভেঙে গিয়েছে। একটি লোক মেশিনে বোতাম টিপে ব্যাগটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে সেলোফেন পেপার দিয়ে বেঁধে ফেলেছে। তারপর একটা ছুরি দিয়ে পেপারটা কেটে ব্যাগের হ্যান্ডেল দুটো বার করা হলো । ব্যান্ডেজ লাগানো ব্যাগটা আমরা লাগেজে জমা করে দিলাম। ব্যাগটা দেখতে যা হয়েছে সে আর বলার নয়।

সিকোরিটি চেকিং এর পরে ভেতরে ঢুকে গেলাম। কড়াকড়ি বিশেষ ছিল না তাই রক্ষে। এর আগে কোন কোন এয়ারপোর্টে

Scanned with OKEN Scanner

জুতো অবধি খুলতে হয়েছে। সুতপার তো হাতের লোহা খুলতে গিয়ে অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের এক বন্ধুর বেল্ট খুলতে গিয়ে প্যান্ট খুলে পড়ে আর কি।

Security checking হয়ে গেলে অনেক নিশ্চিন্তি। আমাদের ১৪ নম্বর গেটে যেতে হবে। Security checking এর সময় অনেককে দেখছিলাম সবুজ টি শার্ট পরিহিত। টি শার্টে হলুদ লোগো। মুখের আদল মঙ্গলয়েডদের মতো। আলাপ করে জানলাম ওরা ভিয়েতনামের বাসিন্দা। লাউঞ্জে যেখানে বসেছিলাম তার চারিপাশে সবুজ টি-শার্ট পরিহিত মেয়েরা বসে আছে। ছেলেদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম । আমি বসে বসে ওদের মুখের অভিব্যক্তি দেখছিলাম। আমরা যারা ষাট সত্তরের দশকে বড় হয়েছি, ভিয়েতনাম তাদের কাছে অতি পরিচিত নাম। মার্কিনিদের সঙ্গে অসম যুদ্ধে ভিয়েতনামিরা জয়ী হয়েছিল। ভিয়েতনামিদের সেই মরণপন যুদ্ধের দৃঢ় মানসিকতা আমাদের মতো স্কুল কলেজে পড়ুয়াদের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল।।

আমাদের সামনে আজ যে সমস্ত তরুণ-তরুনী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া বসে রয়েছেন তাদের পরিবারের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদের কারোর বাবা অথবা মা ,কাকা অথবা কাকিমার হয়তো সেই যুদ্ধে প্রাণ গিয়েছে। এদের পরিবারের রক্তের বিনিময়ে ভিয়েতনাম ১৯৭৫ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। এতদিন পরেও এদের দেখে সম্ভ্রম বোধ হচ্ছিল। ভিয়েতনামের গ্রামের মহিলারা ওদের সন্তানকে নিয়ে মার্কিনী সৈনিকদের বেয়োনেটের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে ভয় পায় নি।। পরাধীনতার থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, তাদের কাছে জীবনের থেকেও বেশি মূল্যবান ।তাঁদের অদম্য মনোভাব , দৃঢ় মানসিকতা, তীব্র জাতীয়তাবোধ মার্কিনিদের পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করে।

মনে পড়ে গেলো সোমনাথ দা (হোর) ভিয়েতনামি মা নামে একটি ব্রোঞ্জের স্থাপত্য তৈরি করেছিলেন। সাইগনের পতন এবং ভিয়েতনামের দীর্ঘযুদ্ধের অবসানের পর ১৯৭৫ সালে তিনি কাজটিতে হাত দেন।। প্রায় দু বছর সময় লাগে কাজটি সমাপ্ত করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কাজটি কলা ভবনের স্টুডিও থেকে চুরি হয়ে যায়। ঘটনাটি সোমনাথ দা কে খুব আহত করে । সোমনাথ দা এরপর যতদিন কলাভবনে ছিলেন কোনওয় ভাস্কর্যের কাজে হাত দেননি। কলাভবন থেকে অবসরের পর তিনি আবার ভাস্কর্যের কাজে মন দেন। ১৯৪০ এর দশকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ভিয়েতনামের মানুষের মরনপণ যুদ্ধের সমর্থনে কলকাতায় যে প্রতিবাদ আন্দোলন হয় সোমনাথ দা তাতে যোগ দেন।। তার কাছে এই লড়াই ছিল একটি আদর্শের লড়াই। তিনি বলেছেন বহু বছর আমি ভিয়েতনামের যুদ্ধকে নিজের মধ্যে লালন পালন করেছি। তিনি লিখেছিলেন ' ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিদিনের খবর পড়ে আমি হতাশ হয়ে পড়ি। দীর্ঘ ২৯ বছরের সংগ্রাম যখন সম্পূর্ণ বিজয়ে শেষ হয়েছিল তখন আমি আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য করেছিলাম, ভিয়েতনামী মা। এটি একটি মায়ের মূর্তি , নাপাম বোমার আঘাতে যার বক্ষদেশ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে, মাথা উঁচু করে সে একটি শিশুকে বাহুতে জড়িয়ে রেখেছে স্বাধীনতার আশায়। এটি একটি অপরাজেয় ভাস্কর্য এবং বাহুতে জড়ানো শিশুটি নবজীবনের প্রতীক।

৬ সেপ্টেম্বরঃ

হ্যানয় এয়ারপোর্টে যখন পৌছালাম তখন প্রায় রাত দুটো। ইমিগ্রেশন চেক করিয়ে এয়ারপোর্টের বাইরে এসে দেখি একজন ভিয়েতনামি আমার নামের প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে আছে। হেসে করমর্দন করে গাড়িতে গিয়ে চাপলাম। ভদ্রলোক আমাদের আগামীকালের গাইড। ভোররাতে আলো ঝলমলে রাস্তা। খানিক দূর যাবার পর একটি বিশাল নদী পেরিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল। শহরের উপকণ্ঠ দিয়ে চলেছি। ঘরবাড়ি চোখে পড়ছে। খানিক বাদে রাস্তার মোড়ে এসে পৌঁছলাম। এই ভোর রাতেও বেশ লোক চলাচল করছে। মেয়েরা সাইকেলে করে কাজে যাচ্ছে। পথে পড়ল একটি ফুলের বাজার। গাইড জানালো এটা সারারাত খোলা থাকে দিনের বেলা বন্ধ।

হোটেলে পৌঁছে দেখি একটি ছেলে রিসেপশনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের মালপত্র নামিয়ে খাতায় সই করিয়ে, জানিয়ে দিল আমাদের ঘর ৯ তলায়। সকালবেলায় সাড়ে ছটা থেকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ব্রেকফাস্ট এর ব্যবস্থা। সকাল আটটায় ঘুম ভাঙলো। তাড়াহুড়ো করে হাত মুখ ধুয়ে স্নান সেরে নিলাম। দশটার পর ব্রেকফাস্ট আর পাওয়া যাবে না। লিফটে চেপে নিচে এসে যখন পৌঁছেছি তখন প্রায় সাড়ে নটা বাজে। ব্রেকফাস্ট রুমে গিয়ে দেখি ভিড় থই থই করছে।

বেশিরভাগই ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকান কিছু অস্ট্রেলিয়ান ও আছে । একটি ভারতীয় পরিবার। বাড়িতে যা খাই অর্থাৎ তরমুজ দই কলা এবং তার সঙ্গে অতিরিক্ত দুটো টিমের অমলেট , টোস্ট এবং কফি। প্রাতঃরাশ সেরে রিসেপশনে দু-চারটি টুকিটাকি কথা বলে রাস্তায় নেমে পড়লাম। আমরা যেখানে আছি, সেটা পুরোনো হ্যানয়।

৭ সেপ্টেম্বরঃ

পুরনো হ্যানয় । রাস্তাঘাট অপরিসর। সার বেঁধে হোটেল। রাস্তাটা একটু বাঁক নিয়ে সোজা এগিয়ে গেছে। দু'ধারে ম্যাসাজ পার্লার। তারই মাঝে মাঝে কফি শপ। বেশির ভাগ দোকানে মহিলারা বসে আছে। রাস্তা দিয়ে সাহেবরা হেঁটে বেড়াচ্ছে। ভিয়েতনাম এখন একটা নামজাদা টুরিস্ট স্পট। খানিক এগোতেই একটা লেক চোখে পড়ল। লেকের ধার দিয়ে লোক জন হেঁটে বেড়াচ্ছে। কারুর গায়ের রং সাদা কালো হলদে কেউ বাদামি। বিচিত্র সব পোশাক পরিহিত। মহিলাদের শরীরের বেশিরভাগ

Scanned with OKEN Scanner

অংশ উন্মুক্ত। কারুর পরনে ছোট স্কার্ট কারুর বা ছোট শর্টস। শরীরের উপরের অংশ যতটুকু না ঢাকলে নয়, ততটুকুই ঢাকা আছে। ইউরোপে প্রায় একই ছবি দেখা যায়, তবে ইয়োরোপে সকলের সাথেই থাকে চেনে বাঁধা একটি কুকুর। রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে অগুনতি স্কুটার। স্কুটার চালকদের মধ্যে মহিলা এবং পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। এখানে আসার পর জেনেছি হ্যানয়ের লোকসংখ্যা এক কোটি ১০ লক্ষর আসে পাশে। এবং স্কুটারের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। লেকের কাছেই একটা কফির দোকানে এসে বসলাম। পাশাপাশি দোকানগুলো মেয়েরাই পরিচালনা করছে। আমাদের কফি সার্ভ করল বয়স্ক এক ভদ্রলোক। কিছুটা গোমড়ামুখো। প্রসঙ্গত বলে রাখি হ্যানয়ে কফির দোকান আমাদের দেশের কলকাতার চা এবং সিগারেটের দোকানের মত। দু তিনটে দোকান পরে পরেই একটি করে কফির দোকান। খোঁজ নিয়ে জানলাম এরা বাড়িতে কফি কম খেলেও, দোকানে বসে আড্ডার সময় কফি এদের পছন্দ। এখানে কফির দাম বেশ বেশি। একটা কফি ৬০ হাজার ডং। ২৪৭০০ ডং এক ডলারের সমান। হিসাবটা বেশ জটিল। অর্থাৎ এক কাপ কফির দাম দুশো টাকা বা তার একটু বেশ বেশি। চায়ের দামও তার কাছাকাছি। ভিয়েতনামের কৃষিজ পণ্যের মধ্যে ধানের পরে কফির উৎপাদন সবথেকে বেশি। কফি প্লান্টেশন ভিয়েতনামে প্রথম শুরু করে ফরাসীরা। ভিয়েতনাম একসময় ফরাসি উপনিবেশ ছিল। প্রায় ৯০ বছর ফরাসিরা এখানে রাজত্ব করে। ১৯৫৫ সালের 'দিয়েন বিয়েন ফু'র যুদ্ধে ফরাসিরা পরাজিত হয়ে দেশ ত্যাগ করে। জেনারেল গিয়াপ এর নেতৃত্বে সেই যুদ্ধের কাহিনী আমাদের কাছে গল্প কথার মত ছিল। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় ভিয়েতনামবাসীকে। মনে পড়ে ১৯৬৯ সালে যখন বিশ্ব ব্যাংকের সভাপতি ম্যাকনামারা কলকাতা এসেছিলেন, তখন কলকাতার নাগরিকরা ও ছাত্র সমাজ তার বিরুদ্ধে গো ব্যাক ধ্বনি তুলেছিলেন। আমাদের শান্তিনিকেতনের দাদারা, যারা যাদবপুর এবং অন্যান্য কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় পড়তেন তাদের কাছে শুনেছি বিমান বোস আর পল্টু দাশগুপ্তদের ডাকে দুই ছাত্র ফেডারেশনের হয়ে তারাও সেই মিছিলে পা মিলিয়ে ছিল, যেখানে ধনী ওঠে ম্যাক ম্যাক ম্যাক নামারা ব্যাক ব্যাক নামারা। শান্তিনিকেতনে আমরা তখন স্কুলের ছাত্র। শান্তিনিকেতনেও বামপন্থী ছাত্র ছাত্রীরা তখন প্রায়ই ভিয়েতনামের সমর্থনে মিছিল বার করতো, স্লোগান উঠত 'আমার নাম তোমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম'। আজকে ৫৫ বছর পরে ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে বসে কফি কাপ হাতে স্মৃতির অতলে ডুব দিয়েছি। এখনো পুরোনো দিনের কথা ভাবলে শিহরণ জাগে। এক বুক আশা নিয়ে এসেছি নতুন ভিয়েতনাম কে দেখব বলে। দুপুরে হোচি মিন মোসেলিয়মের সামনে দিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম ওয়েস্ট লেক। মোসেলিয়মে হোচিমিনের দেহ কৃত্রিম উপায়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। রাশিয়া এবং চায়নাতেও দেখেছি লেনিন এবং মাও সে তুংয়ের দেহ ক্রেমলিন সংলগ্ন অঞ্চলে এবং তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে একই উপায়ে সংরক্ষিত করা আছে।

লেনিন, মাওসে তুং, হো চি মিন না থাকলেও তাদের জীবন দর্শন বেঁচে থাকবে। সেজন্য তাদের দেহ কৃত্রিমভাবে রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। ওয়েস্ট লেকের পাশে প্রায় ১৫০০ বছরের পুরনো একটি প্যাগোডা রয়েছে। বুদ্ধ মন্দিরটির পাশে দীর্ঘদিন ধরে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বাস করে। Tran quok প্যাগোডাটি হ্যানয়ের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন একটি বুদ্ধমন্দির। ভিয়েতনামে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও, ধর্মীয় স্থানগুলি কখনো আক্রমণের বস্তু হয়ে ওঠেনি। ক্যাথলিক গির্জা গুলো অক্ষত আছে। সোভিয়েত দেশের সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্টালিনের আমলে সেন্ট পিটার্সবার্গের ২০০ টিরও বেশি ধর্মীয় স্থান ভেঙে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু ভিয়েতনামে হো চি মিন এবং ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি সেটা হতে দেননি।

গাড়িতে চাপার পর আমাদের গাইড জানালো যে একটা খারাপ খবর আছে। ঝড় আসছে, টাইফুন। ১০৩ কিলোমিটার বেগে ঝড় আছড়ে পড়বে শহরের উপর। আমরা রাস্তায় যেতে যেতেই বৃষ্টি নাবলো এবং চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠলো। আমার ছেলেবেলায় পড়া মোহিত লাল মজুমদারের কবিতার দুটো লাইন মনে পড়ে গেল

'মধ্য দিনের রক্ত নয়ন অন্ধ করিল কে
ধরণীর 'পরে বিরাট ছায়ার ছত্র ধরিল কে।'

(চলবে)

তাজমহল ঃ বিকৃত ইতিহাস প্রচার বনাম প্রকৃত তথ্য

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

২০১৭ সালে উত্তর প্রদেশের বিজেপি সরকারের পর্যটন বিভাগ প্রকাশিত প্রচার পুস্তিকায় অনুপম সুন্দর সৌধ 'তাজমহল'ও অন্যান্য মুঘল স্থাপত্য স্থান পায়নি। পরিবর্তে তাতে স্থান পেয়েছিল শুধু কিছু হিন্দু মন্দির যার মধ্যে আছে গোরক্ষপুরের গোরখনাথের মন্দির, মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ যে মন্দিরের মোহন্ত। এই মন্দিরের আদৌ কোনও স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য আছে বলে কোনও পুরাকীর্তিবিদ উল্লেখ করেন নি। এর আগে ওই বছর জুন মাসে আদিত্যনাথ বলেছিলেন 'তাজমহল' ও অন্যান্য মুঘল স্থাপত্য ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক নয়। এর আগে ওই দলের নেতা মুজফফরনগর দাঙ্গাখ্যাত সঙ্গীত সোম বলেছিলেন তাজমহলের নির্মাতা শাহজাহান নিজের বাবাকে বন্দি করে

Scanned with OKEN Scanner

রেখেছিলেন এবং অসংখ্য হিন্দুকে হত্যা করেছিলেন। তার এই বক্তব্য ইতিহাসের কোনও তথ্যের দ্বারাই সমর্থিত নয়।

আবার ওই দলেরই বিনয় কাটিয়ার বলেছেন ওখানে 'তেজো মহালয়া' বলে একটি হিন্দু মন্দির ছিল। সেটিই নাকি শাহজাহান পরিবর্তন করে 'তাজমহল' করেছেন। আর সুব্রাহ্মনারায়ণ স্বামী বলেছেন ওখানে জয়পুরের রাজা জয় সিংহের প্রাসাদ ও মন্দির ছিল। শাহজাহান নাকি জোর করে দখল করে নেন। এই সব তত্ত্বের উৎস কি তা অবশ্য কেউই জানাননি।

উপরোক্ত নানা ধরণের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা বক্তব্য ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপপ্রচার কখনই কোনও মান্য ঐতিহাসিকের দ্বারা সমর্থিত হয়নি। পি. এন. ওক নামক একজন হিন্দুত্ববাদী ব্যক্তি গত শতকের আটের দশকে একটি পুস্তক লিখে প্রচার করা শুরু করেন যে তাজমহল একটি হিন্দু মন্দির ছিল। সম্রাট শাহজাহান সেটিকে তাঁর পত্নীর স্মৃতিতে একটি সমাধি সৌধে রূপান্তরিত করেন। শ্রী ওক আদৌ ঐতিহাসিক বা অধ্যাপক ছিলেন না। তিনি ছিলেন ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের দপ্তর কর্মী। অথচ তাঁকে অধ্যাপক বলে প্রচার করা হয়।

এই উদ্ভট তত্ব পৃথিবীর কোনো মান্য ঐতিহাসিক গ্রহণ করেননি। শ্রী ওক সুপ্রিম কোর্টে ২০০৫ সালে একটি মামলা করেন। সেটি খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট বলে তাঁর মাথায় পোকা আছে (Bee in his bonnet)। বর্তমানে হিন্দুত্ববাদীরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে আবারও ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য ব্যাপক প্রচার শুরু করেছে।

প্রকৃত ইতিহাস কখনো পরিবর্তন করা যাবেনা। তবে বলপূর্বক রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে কোনোদিন 'তাজমহলে' শিবলিঙ্গ স্থাপন করার চেষ্টা হবে না সেকথা বলা যায় না। হয়তো তখন নামকরণ করা হবে 'তেজো মহালয়া'।

তাজমহল নির্মাণের ইতিহাস ঃ ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার তাঁর 'Studies in Mughal India' গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে 'তাজমহল' নির্মাণের কথা লিখে গিয়েছেন। পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের ইতিহাসে মুঘল শাসন সম্পর্কে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থ লেখার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক আচার্য সরকার সম-সময়ের বিভিন্ন লেখকের ফার্সি ভাষায় লেখা গ্রন্থ সমূহ, বিভিন্ন এদেশীয় ব্যক্তি ও ইউরোপীয় পর্যটকদের ভ্রমণ কাহিনী অধ্যয়ন করেছেন। আচার্য সরকার ফার্সি ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন।

১৬০৭ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র খুররম (পরে শাহজাহান) এর সঙ্গে পত্নী নূরজাহানের ভাইঝি আরজুমান্দ বানু বেগম এর বিবাহ পাকা করেন। ১৬১২ সালে তাঁদের বিবাহ হয়। তখন শাহজাহানের বয়স ২০ বছর ৩ মাস। কনের বয়েস তাঁর থেকে ১৪ মাস কম। বিবাহের পর কনের নামকরণ করা হয় 'মমতাজ মহল 'অর্থাৎ প্রাসাদের আলো'। ১৯ বছর বিবাহিত জীবন যাপনের পর ১৬৩১ সালের ৭ জুন চতুর্দশ সন্তান প্রসবের (এর নাম ছিল গহরআরা) সময় মমতাজের মৃত্যু হয়। শাহজাহান তখন দাক্ষিনাত্য অভিযানে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে মমতাজ ছিলেন। তাঁকে প্রথমে বুরহানপুরে তাপ্তি নদীর তীরে সমাধিস্থ করা হয়। শোকগ্রস্ত সম্রাট সিদ্ধান্ত নেন তাঁর স্মৃতিতে আগ্রায় এক অতুলনীয় সমাধি মন্দির নির্মাণ করবেন।

আগ্রার দক্ষিণে যমুনার তীরে অম্বর রাজ জয়সিংহের কাছ থেকে এক প্রশস্ত ও বিরাট জমি কেনা হয়। ১৬৩২ সালের গোড়ায় তাজমহলের নির্মাণ শুরু হয়। প্রাথমিক নির্মাণ কাজ চলার সময়েই মৃত্যুর ২০ মাস পর মমতাজ মহলের দেহাবশেষ বুরহানপুর থেকে আগ্রায় নিয়ে এসে সমাধিস্ত করা হয়।

তাজমহল নির্মাণের দেখাশোনা করেন মুকাররামত খান ও মীর আব্দুল করিম নামক দুজন দক্ষ স্থপতি। সাম্রাজ্যের দক্ষ স্থপতিদের কাছ থেকে সৌধটির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। চুড়ান্ত অনুমোদন করেন সম্রাট নিজে। কিন্তু প্রতিটি কাজেই দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়। যথা - ১) কান্দাহারের আমানত খান সিরাজি - ক্যালিগ্রাফি তথা তুঘরা ইন্সক্রিপশন এর জন্য। ২) উস্তাদ ঈশা - প্রধান রাজমিস্ত্রি , আগ্রা। ৩) উস্তাদ পীরা - কাঠের কাজ, দিল্লি। ৪) বানুহার,ঝাটমল ও জাবোয়ার-ভাস্কর,দিল্লি। ৫) ইসমাইল খান রুমি-সুউচ্চ গম্বুজ ও তার ভার বহনকারী ঢোলা (scaffolding) পারস্য। ৬) রাম সাই কাশ্মীরি-সমাধি প্রাঙ্গণ ও চারবাগ উদ্যান রচনার জন্য। এই উদ্যান এখনো আছে।

২০ রকমের অতি মূল্যবান পাথর(বিপুল পরিমাণ শ্বেতপাথর সহ) আমাদের দেশ ও পৃথিবীর বহু দেশ থেকে আনা হয়েছিল তার বিস্তৃত বিবরণ আচার্য সরকারের গ্রন্থে আছে। তাজমহলের মূল নির্মাণ কাজ ১৬৪৩ সালে সম্পূর্ণ হলেও ১৬৪৮ সাল পর্যন্ত অতি সুক্ষ ও সৌন্দর্য্যায়নের কাজ চলেছিল।

মুঘল শাসনে আকবরের সময় থেকেই (১৫৫৬-১৬০৫) অনুপম সব স্থাপত্যকীর্তি রচিত হয়েছে। সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি সৌধ, ফতেপুর সিকরি, আগ্রা ফোর্ট, সেকেন্দ্রাবাদে আকবরের সমাধি, লাহৌরের জাহাঙ্গীরের সমাধি, দিল্লির লাল কেল্লা ও জুম্মা মসজিদ, আগ্রা ফোর্টের মতি মসজিদ তার নিদর্শন। শেষোক্ত চারটি শাহজাহানের তৈরি। তাঁর শাসনকালকে মুঘল স্থাপত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয় । পারস্য , মুঘল ও ভারতীয় স্থাপত্যরীতির সার্থক মিলন ঘটিয়েছিলেন মহামতি আকবর থেকে শাহজাহান পর্যন্ত মুঘল সম্রাটরা।চিত্রকলা ও সংগীতের ক্ষেত্রেও এঁদের অবদান ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে অমূল্য সংযোজন। গোঁড়া ও রক্ষণশীল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭) স্থাপত্য, চিত্রকলা ও সংগীত ছিল না-পসন্দ। তাঁর পর মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগ।

তাজমহল পারসিক-মুঘল-ভারতীয় স্থাপত্যকলার শেষ শ্রেষ্ঠ

Scanned with OKEN Scanner

নিদর্শন। ওই সুবিশাল গম্বুজ ও মিনারের স্থাপত্য কলা পারস্য থেকে এসে ভারতের স্থাপত্য কলাকে সমৃদ্ধ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাজমহল প্রসঙ্গে লিখেছেন ;

'প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে'

তাজমহল সম্পর্কে ঐতিহাসিক বেণীপ্রসাদ সাকসেনার 'History of Sahajahan', ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের 'The history and culture of the Indian people-7th volume' এও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই ঐতিহাসিকরা ওই আমলের প্রচুর গ্রন্থ ও দলিল-দস্তাবেজের সাহায্য নিয়েছেন। 'জেরেনিমো ভেরোনিও' বলে একজন ইতালিয়ান স্থপতি তাজমহলের নকশা করেছিলেন বলে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ উল্লেখ করেন। তাঁর এই মতের সমর্থনে তিনি কোনো যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ দিতে পারেন নি।

ইউরোপীয় পর্যটক ও জহুরী তাভার্নিয়ের এবং চিকিৎসক বার্নিয়েরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকেও তাজমহল সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

দুর্বল মুঘল সম্রাটদের আমলে তাজমহল কতবার লুণ্ঠিত হয়েছে জাট বিদ্রোহীদের দ্বারা ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে, তার বিবরণও পাওয়া যায়। লর্ড বেন্টিঙ্ক এই সৌধের মূল্যবান শ্বেতপাথর বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিছুটা ক্ষতিও হয় তার ফলে।

ভারতীয় সভ্যতার পরম্পরা কি আবার লুণ্ঠনের সম্মুখীন হবে? এখন প্রশ্ন সেটাই।

শ্রীলঙ্কায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বামপন্থীদের জয়

অতুল চন্দ্র, বিজয় প্রসাদ

---

২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, শ্রীলঙ্কার নির্বাচনী কর্তৃপক্ষের তরফে ঘোষণা হল, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন জনতা বিমুক্তি পেরামুনার (জেভিপি)-র নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (এনপিপ)-র প্রার্থী অনুরা কুমার দিশানায়েকে। ২০১৪ সাল থেকে বামপন্থী রাজনৈতিক দল জেভিপি-র নেতৃত্বে থাকা দিশানায়েকে ৩৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করেছেন যার মধ্যে রয়েছে বিদায়ী রাষ্ট্রপতি ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টির রনিল বিক্রমসিংঘে এবং নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সমাগি জন বালাওয়েগাভার সাজিথ প্রেমাদাসা। শ্রীলঙ্কা পড়ুজন পেরামুনা (এসএলপিপি) এবং ইউএনপি-র মতো শ্রীলঙ্কার পরম্পরাগত রাজনৈতিক দলগুলি যারা এতদিন প্রভাব বিস্তার করে এসেছে রাজনীতিতে তারা পেছনে পড়ে গেছে যদিও শ্রীলঙ্কার সংসদে এখনও তাদেরই প্রাধান্য (মোট ২২৫ টি আসনের মধ্যে এসএলপিপি ১০৫টি আর ইউএনপি ৩টি আসন)।

দিশানায়েকের দল জেভিপি-র সংসদে আসন রয়েছে মাত্র ৩টি। দেশের নবম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দিশানায়েকের বিজয় একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এবারই প্রথম দেশের মার্কসবাদী ধারার একটি দল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভ করল। ১৯৬৮ সালে জন্ম 'একেডি' নামে পরিচিত দিশানায়েকে কলম্বো থেকে অনেক দূরের উত্তর-মধ্য শ্রীলঙ্কার শ্রমিক পরিবারের সন্তান। শ্রীলঙ্কার ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব ও জেভিপি-র একজন কর্মী হিসেবে কর্মরত থাকার মধ্য দিয়ে তাঁর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী সিরিমাভো বন্দরনায়েকের কন্যা চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গের ১৯৯৪ থেকে ২০০৫ অবধি রাষ্ট্রপতি থাকার সময়ে জেভিপি-র সাথে আঁতাত গড়ে উঠলে দিশানায়েকে সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। কুমারাতুঙ্গের মন্ত্রীসভায় দিশানায়েকে ছিলেন কৃষি, ভূমি এবং পশুসম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী যে-পদে থাকার সুবাদে প্রশাসক হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের পাশাপাশি কৃষি-সংস্কার নিয়ে বিতর্কে জনগনকে শামিল করতে সমর্থ হন (রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর আবার এটি মুখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে)। ২০১৯ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি আরেকবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিফল হয়েছিলেন, কিন্তু তার জন্যে দিশানায়েকে বা এনপিপি দমে যায়নি।

আমাদের বিজয় সমাবেশের অঙ্গ হিসেবে গতকাল রিদিগামা সমাবেশে (১৭) যোগ দিলাম। দেশকে এক নতুন নবজাগরণ ও 'সমৃদ্ধ দেশ, সুন্দর জীবন' আদর্শের পথে চালিত করার লক্ষ্যে আপনাদের উপস্থিতি ও ২০২৪-এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সমর্থন সত্যিই প্রশংসনীয়!

অর্থনৈতিক অস্থিরতা ঃ ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল আরাগালয়া (প্রতিবাদ) যার পরিণতিতে রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ দখল হয়ে যায় এবং রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপক্ষেকে তড়িঘড়ি দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। এই প্রতিবাদের কারণ ছিল দেশের-মানুষের অর্থনৈতিক সম্বলহীনতা; জ্বালানি, খাদ্য ও ওষুধের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব তাদের রাস্তায় নামতে বাধ্য করে। শ্রীলঙ্কা বৈদেশিক ঋণ মেটাতে ব্যর্থ হয়ে দেউলিয়া হয়ে যায়। প্রতিবাদী মানুষের আয়ের রাস্তা প্রশস্ত না-করে; নয়া-উদারবাদী ও পাশ্চাত্য ঘেঁষা বিক্রমসিংঘে রাষ্ট্রপতির পদ দখল করেন রাজাপক্ষের ৬ বছরের মেয়াদ সম্পূর্ণ করার জন্য। রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিক্রমসিংঘের অপদার্থ শাসনকাল ওই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের অন্তর্নিহিত কারণগুলির কোনও সমাধান করেনি। ২০০৩ সালে শ্রীলঙ্কাকে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের দুয়ারে দাঁড় করিয়েছে ২.৯ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা অনুদানের জন্যে (১৯৬৫ সাল থেকে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের কাছ থেকে নেওয়া এটা ১৭ নম্বর অনুদান) যার জেরে বিদ্যুতের মতো সামগ্রীর উপর থেকে ভরতুকি প্রত্যাহার করা হয় এবং ১৮%-র

Scanned with OKEN Scanner

ওপর দ্বিগুন হারে বাড়তি মূল্যযুক্ত কর যোগ করা হয়। এই ঋণের বোঝা বইতে হচ্ছে কোনও বাইরের ঋণদাতাকে নয়, শ্রীলঙ্কার শ্রমিক শ্রেণিকেই। দিশানায়েকে বলেছেন তিনি এই বন্দোবস্ত উল্টে দেবেন এবং চুক্তির পর্যালোচনার মাধ্যমে বাইরের ঋণদাতাদের ওপর অধিকতর দায়িত্ব চাপাবেন, আয়করের সীমা বৃদ্ধি করবেন এবং একাধিক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যকে (খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার) বাড়তি করের আওতার বাইরে নিয়ে আসবেন। দিশানায়েকে যদি সত্যিই এই কাজ করতে পারেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি দমনে হস্তক্ষেপ করেন, তবে গৃহযুদ্ধ-ক্লান্ত ও রাজনীতির কুলীন কূলের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য ছাপ রাখতে সমর্থ হবেন।

রাষ্ট্রপতি ভবনে এখন একটি মার্কসবাদী দল ঃ ১৯৬৫ সালে একটি মার্কবাদী লেনিনবাদী দল হিসেবে জেভিপি বা গণমুক্তি ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা। রোহানা উইজেউইরার (১৯৪৩-১৯৮৯) নেতৃত্বে এই দল ১৯৭১ ও ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯-এ দু-বার অন্যায়, দুর্নীতিগ্রস্ত ও নিয়ন্ত্রণাতীত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে। দুটি অভ্যুত্থানই নৃশংসভাবে দমন করে রাষ্ট্র যার ফলে উইজেউইরা সহ হাজার হাজার সদস্যের হত্যার ঘটনা ঘটে। ১৯৮৯ সালের পর জেভিপি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথ পরিহার করে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে প্রবেশ করে। জেভিপিতে দিশানায়েকের পূর্বসূরী নেতা সোমাওয়ানসা আমেরাসিংঘে (১৯৪৩-২০১৬) আটের দশকের শেষে দলের প্রধান নেতৃবৃন্দের হত্যার ঘটনার পর দলকে পুনর্গঠন করেন। নির্বাচনী সংগ্রাম ও সামাজিক ক্ষেত্রের লড়াইয়ে সমাজতান্ত্রিক নীতির স্বপক্ষে দলকে একটি বামপন্থী দল হিসেবে গড়ার কাজটি এরপর গ্রহণ করেন দিশানায়েকে। জেভিপি-র এই চমকপ্রদ অগ্রগতিটি দিশানায়েকের প্রজন্মের অবদান; যারা বয়সে দলের প্রতিষ্ঠাতাদের চেয়ে অন্তত কুড়ি বছরের ছোটো এবং যারা শ্রীলঙ্কার শ্রমজীবী জনগণ ও দরিদ্রতর মানুষের মধ্যে দলের আদর্শগত ভিত্তি প্রোথিত করতে সমর্থ হয়েছেন। তবে দলের কিছু কিছু নেতার সিংহলী জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ার (বিশেষ করে যখন এলটিটিই-র জঙ্গি কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের প্রশ্ন এসেছে) প্রবণতার প্রেক্ষিতে তামিল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সাথে দলের সম্পর্কের প্রশ্নটি থেকেই যাচ্ছে। স্বজনপোষণে ডুবে থাকা দুর্নীতিগ্রস্ত অভিজাত শাসকবর্গের সম্পূর্ণ বিপরীতে দিশানায়েকের ব্যক্তিগত সততা ও জাতিগত বিভাজনের দৃষ্টির উর্ধ্বে উঠে শ্রীলঙ্কার রাজনীতিকে পরিচালনা করতে চাওয়ার মানসিকতাই ব্যক্তি হিসেবে তাঁর এই উত্থানের প্রধান কারণ।

বাম সংকীর্ণতাবাদের প্রত্যাখানও জেভিপির পুনঃপ্রতিষ্ঠার অংশত একটি কারণ। একুশটি বাম ও মধ্য-বাম সংগঠনকে নিয়ে পার্টি ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (এনপিপি) জোটটি গঠন করেছে যাদের অভিন্ন কর্মসূচি হচ্ছে শ্রীলঙ্কার জনগনের বৃহত্তর অংশের স্বার্থে দুর্নীতি ও আইএমএফ-এর ঋণ ও ব্যয় সংকোচের নীতির মোকাবিলা করা। এনপিপি-র কিছু কিছু অংশীদারদের মধ্যে তীব্র নীতিগত মতপার্থক্য থাকলেও রাজনীতি ও কর্মসূচির ক্ষেত্রে অভিন্ন কর্মসূচির প্রতি দায়বদ্ধতা ব্যক্ত করা হয়েছে। এই কর্মসূচিটি স্বনির্ভরতা, শিল্পায়ন ও কৃষি সংস্কারের অর্থনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। এনপিপি-র প্রধান শক্তি হিসেবে জেভিপি দেশের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির (বিশেষ করে জ্বালানি ব্যবস্থাপনার মতো জরুরি ক্ষেত্র) জাতীয়করণ ও প্রগতিবাদী করারোপ ও সামাজিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পদের পুনর্বন্টনের স্বপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে। জাতিগত সংঘাতে বিদীর্ণ শ্রীলঙ্কার সমাজে অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের এই বার্তাটি সাদরে গৃহীত হয়েছে।

অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের এই কর্মসূচিটি কতটা বাস্তবায়িত করতে পারবেন দিশানায়েকে সেটাই আগামী দিনে দেখার। তবে তাঁর বিজয় নিশ্চিতভাবেই নতুন প্রজন্মের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে পেরেছে যারা অনুভব করতে পারছে যে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের অবসন্ন প্রকল্প ছাড়াও দেশ এগোতে পারে এবং শ্রীলঙ্কাকে এমন একটি পথে পুনর্গঠিত করার প্রচেষ্টাটি দক্ষিণ গোলার্ধের রাজনীতিতে একটি আদর্শ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

লেখকদের দু'জনেই ট্রাইকন্টিনেন্টাল ইনস্টিট্যুট ফর সোসাল রিসার্চের সাথে যুক্ত। অনুবাদ- শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার

মোদানী সরকার চায় ধনী ব্যবসায়ীদের চূড়ান্ত একাধিপত্য

অমিতাভ সিংহ

একটি শব্দবন্ধ বেশ প্রচারিত হয়েছে। মোদানী,অর্থাৎ মোদী যুক্ত আদানী।কিন্তু কেন এত বছর পরে সাধারণ মানুষ মোদী- আদানী মধুচন্দ্রিমা নিয়ে এত বলাবলি করছেন? এই সম্পর্ক তো আজকের নয়! গত দুই দশক ধরেই চলছে। সেই যখন নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, ২০০২ সালের দাঙ্গায় মদত দেওয়ার জন্য তৎকালীন বিজেপির নেতা ও দেশের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী তাকে রাজধর্ম পালন করার উপদেশ দিচ্ছেন, সেই সময় থেকে।ওই সময় সরকারের ওপর শিল্পপতিদের আস্থা তলানীতে। শিল্পপতিদের সংগঠন কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ বা সিআইআই শিল্পপতিদের বলছে, গুজরাট শিল্পবান্ধব রাজ্য নয়, শিল্পের অনুকুল পরিবেশ নেই ওই রাজ্যে,তাই ওখানে শিল্পে বিনিয়োগ করতে যাওয়া ঠিক হবে না। ঠিক তখনই মোদীকে উদ্ধার করতে যিনি এগিয়ে এলেন তার নাম গৌতম আদানী। মোদীর নিজস্ব চিয়ার লিডারের ভূমিকা পালন করতে গুজরাটের বড় ব্যবসায়ী ও তাদের নেতৃত্বকে বোঝালেন যে রাজ্যে শিল্প করতে হবে। তার জন্য যথেচ্ছ কর ছাড়,বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা এসইজেড,গরীবের জমি জবরদখল করে অধিগ্রহণ , প্রায় বিনামূল্যে জমির ব্যবস্থা সবই মোদী সরকার করবে। (টাটার ন্যানো গাড়ীর কারখানা সিঙুর থেকে সানন্দে চলে

Scanned with OKEN Scanner

যাওয়ার ঘটনাটিতে একই সুবিধা দেওয়া হয়েছিল,১০০০ একরের বদলে ৫০০০ একর জমি জোর করে জলের দামে অধিগ্রহণ করেছিল গুজরাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন , ২০০০ চাষীর প্রতিবাদকে নস্যাৎ করে) ক্ষ্মভাইব্রান্ট গুজরাটক্ষ্ম শিরোনামে শীর্ষ সম্মেলন করে তিনি মোদীর হয়ে শিল্প জোগাড়ে উদ্যোগের মধ্যে মোদীর গুড বুকে ঢুকে পড়েন। ঠিক তার পরেই তার আনুগত্যের পুরস্কার পেতে আরম্ভ করতে লাগল গৌতম আদানীর পরিবার ও গোষ্ঠী। রাজ্যে একাধিক শিল্প গড়ার সুযোগ বেআইনী ভাবে পাওয়া তো আছেই। একই এস ই জেডে অন্য শিল্পপতিরা যে দামে জমি পেয়েছেন তার থেকে অনেকটা কম দামে আদানীরা জমি পেয়েছে। স্কোয়ার মিটার পিছু ১ টাকা থেকে ৩২ টাকা। ৩০ বছরের জন্য রাজ্যের বন্দরগুলি যেমন মুন্দ্রা,হাজিরা,দেহেজ ইত্যাদির পরিচালনার ভার তুলে দেওয়া হয়েছে আদানী পোর্টের হাতে।দেশের সর্ববৃহৎ ব্যাক্তিগত বা বেসরকারী জলবন্দর মুন্দ্রা তে বিনিয়োগ করতে পেরেছেন শুধু আদানী গোষ্ঠী।

শুধু আদানী নয় মোদী ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা গুজরাটে জলের দরে জমি পেয়েছেন।প্রচুর এসইজেড।সেখানে জমি নিয়েও যারা শিল্প না করে ফেলে রেখেছেন পরে অতি উচ্চ দামে বিক্রি করবে বলে, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি।প্রচুর কর ছাড়, পরিবেশের ক্ষতির তোয়াক্কা না করে যে শিল্প তিনি করেছিলেন তাতে বৃদ্ধি হয়ত হয়েছে কিন্তু সাধারণ মানুষের উন্নয়ন হয় নি।রাজ্যের গরীবেরা আরো গরীব হয়েছে। স্কুল কলেজের শিক্ষকেরা অতি অল্প বেতনে কাজ করছে। বেশীরভাগ সরকারি স্কুল বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার ফলে তাতে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ীর সন্তানেরা পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে না। এরাজ্যে শিক্ষা হয়ে গেছে ধনীদের করায়ত্ত। যেমন সারা ভারতে চিকিৎসাবিদ্যা হয়ে পড়েছে। কয়েকমাস আগে কমন এলিজেবিলিটি এন্ড এডমিশন টেস্টের ফলাফল কেলেঙ্কারি তা বেআব্রু করে দিয়েছে।

মনে আছে নিশ্চয় ২০১৪ সালের লোকসভার নির্বাচনে সারা দেশ জুড়ে মোদী চষে বেরিয়েছিলেন যে বিমানে তাতে ক্ষ্মআদানীক্ষ্ম শব্দটি বড় বড় করে লেখা ছিল। মিথ্যার বেসাতি ও প্রচার চলেছিল এই সময়। (এর আগে আন্না হাজারেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই দেখাতে গিয়ে আন্নাকে তো প্রায় মহাত্মা গান্ধী বা জয়প্রকাশ নারায়ণ বানিয়ে ছেড়েছিল আরএসএস ও বিজেপি। টু জি স্পেকট্রাম এ ১৮৬,০০০ কোটি টাকার দুর্নীতির কথা প্রচার করা হয়েছিল। পরে জানা গেল তা ছিল নোসানাল লস,অর্থাৎ বিকল্প পরিস্থিতিতে সরকার বাড়তি আয় করতে পারত। সেসময় তো সিএজি ডিরেক্টর বিনোদ রাই যে বিজেপিকে তুষ্ট করতে এই মিথ্যা রিপোর্ট তৈরী করেছিল তা অনেক পরে জানা গিয়েছিল। বস্তুত মনমোহন সিং আমলে আর্থিক বৃদ্ধির হার যেমন মোদী আমল থেকে বেশ কিছুটা ওপরেই ছিল,তার সাথে ছিল সব ধরণের মানুষের উন্নয়ন। একাধিক যুগান্তকারী আইন প্রণয়ন। সবই ওয়েলফেয়ার স্টেট বা কল্যাণকামী রাষ্ট্রের সজ্ঞা মেনে। আসলে মনমোহন সিং এর শিক্ষা,ভদ্রতা ও শিষ্টাচার মোদী - শাহের স্তরে নামতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। তাই মৌনী প্রধানমন্ত্রী শব্দটি তার নামের পাশে বসাতে সুবিধা হয়েছিল।অমিত - শাহ তো মোদীর ১৫ লক্ষ টাকা প্রতিটি মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিকে জুমলা বা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।হয়তো ক্ষ্মআচ্ছে দিনক্ষ্মটাও যে জুমলা ছিল তা ভবিষ্যতে স্বীকার করে নেবেন)।

এমনকি এই মোদী, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতে গুজরাট থেকে দিল্লী গিয়েছিলেন এই আদানীদের ব্যক্তিগত বিমানে। তখন কি বোঝা যায় নি আদানীরাই মোদীর ব্লু আইড বয়।আত্মার আত্মীয়।প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সেসব মনে রেখেই শুরু হল তার পাওনা শোধের পালা।শুধু আদানী গোষ্ঠীই নয় সমস্ত গুজরাটি বেওসায়ীদের জন্যই ছিল তার দরজা খোলা। বাদ ছিল শ্রমিক , গরীব কৃষক, নিম্ন মধ্যবিত্ত, গরীব মানুষ। জনগণের টাকা মেরে মোদীর বন্ধু ক্রনি ক্যাপিটালিস্টরা যাতে সসম্মানে দেশ ছাড়তে পারে তার জন্য তো প্রচেষ্টা কম ছিল না। মেহুল চোক্সি ,নীরব মোদী,বিজয় মাল্য,ললিত মোদী আরো কত নাম বলব। ৩২ জন পুঁজিপতি বা ব্যবসায়ী যার মধ্যে ২৫ জনই গুজরাটি। জনগণের ব্যাঙ্কে রাখা টাকা ঋণ হিসাবে নিয়ে তা শোধ না করেই পগার পার। তার পরিমাণ অন্তত এক লক্ষ কোটি টাকা। এদের পালানোর জন্য সেফ প্যাসেজ করে দিলেন কে? বিজেপি সরকার। এত বছরেও তাদের কেন দেশে ফিরিয়ে আনা গেল না তার জবাব কে দেবে।

কদিন আগেই মুকেশ আম্বানীর ছেলের প্রাকবিবাহ অনুষ্ঠান হল গুজরাটের জামনগরে। ১২০০ জন নিমন্ত্রিত ছিলেন। সিলিকন ভ্যালি থেকে বলিউড। মার্ক জুবেরবার্গ,বিল গেটস,মিরান্ডা ট্রাম্প, পপস্টার রিহানা,যাদুকর ডেভিড ব্লেইন ইত্যাদি। তাদের জন্য কয়েকদিনের জন্য ওই বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তরিত করা হল জনগণের দেওয়া করের কোটি কোটি টাকা খরচ করে। তারপর শুনেছি তার বিবাহের খরচ নাকি ৫০০০ কোটি টাকা। বৈভবের একি অশিক্ষিত প্রদর্শন।

আসলে মোদী শুধুই ব্যবসায়ীদের বন্ধু আম জনতার কথা চিন্তা করার সময় কই তার।রাহুল যখন পরিযায়ী শ্রমিক থেকে ছাত্র, যুব, মহিলা, কৃষক, শ্রমিক,গিগ ওয়ার্কার, মোটরম্যানদের সঙ্গে কথা বলছেন তাদের সমস্যা শুনছেন তখন তিনি ব্যস্ত তার নিজের মন কা বাত শোনাতে, কারও মন কা বাত গত এগার বছরে তিনি শুনলেন কই যে তাদের সমস্যা সমাধান করবেন। মোদী পুঁজিপতিদের দাবী মত দুটি আইন সংস্কার করতে উদ্যত হলেন। একটা জমি অধিগ্রহণ আইন, অপরটি শ্রম আইন। পুঁজিপতিদের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অধিকার চাই। চাই আরো সস্তায় শ্রম কেনা। দেশের গরীব মানুষের পাশে দাঁড়ানো নয়। জমি অধিগ্রহণ আইন সংস্কার করতে গিয়ে রামধাক্কা খেলেন। লোকসভায় পাস করিয়ে রাজ্যসভায় হার। নতুন শ্রম আইন

Scanned with OKEN Scanner

এখনও পাস করাতে পারেন নি। যদিও বিজেপি শাসিত রাজ্য হরিয়ানা,রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে পুঁজিপতিদের পছন্দমাফিক কিছু সংশোধনী সরকার করেছে। কৃষি আইন আনতে গিয়ে সরকার অন্তত ৭০০ কৃষকের প্রাণ হারানোর কারণ হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চলা দিল্লী সীমান্তে কৃষকদের ধর্ণা অবস্থান বানচাল করতে বিজেপি সরকার কি কি করেছে তা আর বিশদে বলার প্রয়োজন নেই। ফলশ্রুতি শেষ পর্যন্ত তিন কৃষি আইন প্রত্যাহার। হরিয়ানায় জাঠ,গুজরাটে প্যাটেল,অন্ধ্রে কাপ্পু,মহারাষ্ট্রে মারাঠাদের মনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। দলিতেরা বিক্ষুব্ধ।

২০১৪ সালে আদানীরা ছিল বিশ্বের ৬০৯ নম্বর ধনী।আর আজ ৩ নম্বর। তাদের মোট সম্পদ ২০১৪ সালের আগে ছিল ৮ বিলিয়ন ডলার আজ ১৪০ বিলিয়ন ডলার। দেশের বিদেশনীতি, প্রতিরক্ষা নীতি, অভ্যন্তরীন নীতি বা কেন্দ্রের বাজেট এমনকি শেয়ার নিয়ন্ত্রক সেবির পরিকাঠামো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে আদানী গোষ্ঠীর সুবিধা হয় ও তাদের কাজে লাগে। মোদী যখনই বিদেশ যান সঙ্গে যান কে? দেশে আছে গৌতম আদানী কোমর বেধেছে। হয় একসঙ্গে নাহলে ঠিক তার পরে পরে।অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হয়েছে। শুধু ২০১৫ সালে ফ্রান্স সফরে রিলায়েন্সের অনিল অম্বানী গিয়েছিলেন।

মনমোহন সিং সরকারের সময় ঠিক হয়েছিল মোট ১২৬ টি যুদ্ধ বিমান ক্রয় করা হবে ফ্রান্সের দাসোলট অ্যাভিয়েশন থেকে। এর মধ্যে ১৮ টি বিমান তারা নিজেরা তৈরী করে সরবরাহ করবে। বাকি ১০৮ টি বিমানের যন্ত্রাংশ তারা ভারতে সরবরাহ করবে ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিন্দুস্থান অ্যারোনেটিকসের অধীনে তা Assembled হবে।

এছাড়া প্রযুক্তি হস্তান্তরের চুক্তিও এর মধ্যে ছিল। কিন্তু মোদী সরকার ফ্রান্সে গিয়ে পুরানো যেসব আলোচনা হয়েছিল তা বাতিল করে দাসল্ট অ্যাভিয়েশনকে বাধ্য করা হল যার কোন অভিজ্ঞতা নেই সেই অনিল অম্বানীর সংস্থার মাধ্যমে ক্রয় করতে। মোট ৩৬ টি বিমান ক্রয় করা হয় প্রতিটি বিমান পিছু ১৫৭০ কোটি টাকা করে। মনমোহন সিং সরকারের আমলে সেই মূল্য ঠিক করা হয়েছিল ৫২৬ কোটি টাকা বিমান পিছু। প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়টিকে বাতিল করা হল। সরকারী অভিজ্ঞ সংস্থা হ্যালকে বঞ্চিত করে এক আনকোরা অনভিজ্ঞ সংস্থাকে বরাত দেওয়া হল। নিরাপত্তা বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটির মতামত যাচাই না করে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হ্যাল বা হিন্দুস্তান অ্যারোনেটিকসকে এই বরাত না দিয়ে অনিল অম্বানী, যার এই সংক্রান্ত কোন অভিজ্ঞতাই নেই তাদের বরাত দেওয়া হল কত কোটি টাকা কাটমানির বিনিময়ে? ইলেকটোরাল বন্ড দুর্নীতিতে তো বে আব্রু হয়ে গেছে সরকার। যেসব ওষুধের কোম্পানিগুলি নিম্নমানের ওষুধ প্রস্তুত করত ও কেন্দ্রীয় সংস্থার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিল তাদের কাছ থেকে এই বন্ডের মাধ্যমে প্রায় আট হাজার কোটি টাকা যা বন্ডের মোট টাকার শতকরা ৭০ ভাগ তা তোলাবাজি করে আদায় করেছিল বিজেপি। সুপ্রীম কোর্ট এই বন্ডকে বেআইনী তকমা দিয়ে বাতিল করেছে। এই তোলাবাজির জন্য আদালত সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কংগ্রেস তার গ্রেপ্তারি ও আদালতের নজরদারিতে তদন্ত চেয়েছে।

মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আদানীদের উত্থান হয়েছে উল্কার গতিতে। যখনই মোদী বিদেশ থেকে ফিরেছেন তার ঠিক পরপরই আদানীরা সেই দেশের সরকারের কাছ থেকে বড় বড় প্রকল্পের বরাত পেয়েছে। প্রতিটি দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর কাছে মোদী শুধু সুপারিশ করেছিলেন তাই নয়,কখনও বা তাদের চাপ দেওয়া হয়েছিল বলে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বহুবার অভিযোগ করেছিলেন। দেখা গেছে হয় মোদীর সঙ্গে অথবা পরে বিদেশে গিয়ে মিলিত হচ্ছেন গৌতম আদানী।

আবার বরাত পাওয়ার পর ভারতের ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানিগুলি আদানী গোষ্ঠীকে বিপুল পরিমান ঋণ দিচ্ছে। এবার একটু দেখে নেওয়া যাক ২০১৪ সাল থেকে কিভাবে আদানী গোষ্ঠী ফুলে ফেঁপে লাল হয়েছে।

২০১৪ সালে মুন্দ্রা জলবন্দরের জন্য এসইজেড পরিবেশ ছাড়পত্র পেল। ১৪০ বর্গমাইল জায়গা নামমাত্র মূল্যে দেওয়া হল।আবার মুন্দ্রা প্রকল্পে ভারত সরকারের পরিবেশ দপ্তর ২০১৩ সালে ২০০ কোটি টাকা জরিমানা ধার্য করে। মোদী সরকার ক্ষমতায় এসে তা মকুব করে দেয়।

এরপরই আদানী গোষ্ঠী অধিগ্রহণ করল বিশিষ্ট সিমেন্ট কোম্পানি এসিসি ও অম্বুজা সিমেন্ট। বিভিন্ন কৃষিজ কোম্পানি,ডেটা টেকনোলোজি ইত্যাদি থেকে মিডিয়া হাউসগুলি। এন ডি টিভি কিভাবে গিলে ফেলল আদানীরা তা নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে।

২০১৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার কারমাইকেল মাইন প্রকল্পের জন্য স্টেট ব্যাংক ১০০ কোটি ডলার ঋণ মন্‌জুর করে। বিদেশের কোন প্রকল্পের জন্য এই প্রথম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কটি এত বড় অংকের ঋণ দিল। কি মনে হয় এতে মোদীর কোন হাত ছিল না? সর্বসমেত এসবিআই মোট ২১,০০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে আদানী গোষ্ঠীকে। আবার সরকারি স্তরে কিভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল তা জানিয়েছেন কয়লা সচিব অনিল স্বরূপ। তিনি বলেন তাকে চাপ দেওয়া হয়েছিল, কোল ইন্ডিয়া যাতে বেসরকারি সংস্থাদের কয়লা বিক্রি করে। আদানীদের অনেক ছাড় দিতেও চাপ দেওয়া হয়। তারাই হয় সবচেয়ে বড় ক্রেতা। ১০ মিলিয়ন টন।দেশের সমস্ত স্টকের এক তৃতীয়াংশ।

২০১৫ সালে কানাডা ও ফ্রান্সে মোদীর সঙ্গে সফরে গৌতম আদানী ছিলেন। ছিলেন বাংলাদেশ সফরে। আদানী পাওয়ার ও রিলায়েন্স পাওয়ার পৃথকভাবে দুটি এমওইউ সম্পন্ন করল বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সঙ্গে। ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা বাংলাদেশে সরবরাহ করবে তারা।

ঝাড়খণ্ডে গোড্ডা থার্মাল পাওয়ার নির্মাণ করল জোর করে স্থানীয় কৃষকদের জমি নিয়ে। রাজ্য সরকার তখন বিজেপি

Scanned with OKEN Scanner

পরিচালনাধীন। উক্ত সরকার এর ফলে প্রতি বছর প্রায় ২২০০ কোটি টাকা লোকসান করবে। উল্টোদিকে আদানীরা লাভ করবে মোট প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা।

২০১৭ সালে কয়লা ও বিদ্যুতের জোগান কম হওয়ার কারণে সরকার কয়লা আমদানী করার সিদ্ধান্ত নেয়। দেশে সেসময় কয়লার যে দাম ছিল তার চেয়ে দশগুণ দামে সেই বরাত পায় আদানী গোষ্ঠী। এবছর মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী মালয়েশিয়া সফর করেন। পরের মাসে আদানীরা কন্টেইনার কোল প্রজেক্টের বরাত পায়।

২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী ইজরায়েল সফর করেন। তিনি সেদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে সুপারিশ করেন আদানীদের ব্যবসা দেওয়ার।ডিসেম্বরে আদানীরা একটা ইজরায়েল কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে মিলিটারিদের জন্য দ্রোন তৈরীর বরাত পেলেন। জুন মাসে সিঙ্গাপুর সফরের পরের মাসেই সিঙ্গাপুরের একটি কোম্পানি আদানী পোর্টে ১০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করল।

২০১৯ সালে দেখা গেল আদানী গোষ্ঠী দেশের ছয়টি বিমানবন্দরের দায়িত্ব পেয়েছে। এগুলি হল আমেদাবাদ, জয়পুর, লখনৌ, থিরুভানাথপুরম, ম্যাঙ্গালোর ও গৌহাটি। আগেই তারা মুম্বাই বিমান বন্দর দখল করেছিল। এই গোষ্ঠীর কোনদিনই বিমানবন্দর পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা ছিল না।

২০২০ সালে কোভিদ মহামারির জন্য মোদী বেশী বিদেশ সফর করতে পারেন নি। প্রথম তিনমাসে তিনি টাকা ছড়িয়ে মধ্যপ্রদেশের নির্বাচিত কংগ্রেস সরকার ভাঙায় এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে 'নমস্তে ট্রাম্প'করতে ব্যস্ত ছিলেন। তারই মধ্যে ফেব্রুয়ারি মাসে মোদী শ্রীলংকা গিয়েছিলেন। জুলাই মাসে শ্রীলংকায় সমুদ্রবন্দরের বরাত পায় আদানীরা।

২০২১ সালে বৈদেশিক দপ্তর ও নীতি আয়োগের প্রবল আপত্তি সত্বেও দেশের কৌশলগত ও অবস্থানগত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর মুম্বই এয়ারপোর্ট তুলে দেওয়া হয়েছিল আদানী গোষ্ঠীর হাতে। জিভি গোষ্ঠীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে। ওই গোষ্ঠীকে কেন্দ্রীয় সংস্থাদের দিয়ে ভয় দেখানোও হয়েছিল বলে জানা গেছে।

ওই বছরে শ্রীলংকা সফরে গিয়ে সেই দেশের প্রেসিডেন্টকে চাপ দিয়ে যাতে আদানী গোষ্ঠীকে কলম্বো সমুদ্রবন্দরের ইস্টার্ন কন্টেনার টার্মিনাল গড়ার দায়িত্ব পায়।

উল্লেখ্য যে সারা পৃথিবীর ব্যবসায়ীদের ব্যবসা যখন কোভিদের সময় তলানিতে তখন আদানীরা তিনগুণ সম্পদ বাড়িয়েছে। ২০২২ সালে নিলাম হয় ৫ জি স্পেকট্রাম এর,যার অর্ধেক পায় মুকেশ আম্বানীর সংস্থা,আদানীরা ২১২ কোটি টাকা খরচ করে এই ব্যবসায় পা রাখে।

মহারাষ্ট্রের ধারাবী পুণনির্মান প্রকল্পের জন্য মুম্বাই এর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ২৪০ হেক্টর জমি আদায় করে আদানী রিয়েল এস্টেট। ৬০,০০০ পরিবারের জন্য আবাসন ও বাণিজ্যিক বহুতল নির্মাণ করবে তারা। এই প্রকল্পটির বরাত আগে দুবাই এর একটি বিখ্যাত সংস্থা পেয়েছিল।

২০২৩ সালে জুন মাসে নেপাল সফর প্রধানমন্ত্রীর আর পরের বছর জানুয়ারি মাসে আদানীরা বরাত পেল বিমানবন্দর নির্মাণ, পরিচালনা ও বেসরকারি সংস্থায় বিনিযোগ করার।

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে কিনিয়া সফরের পর ২০২৪ এর জুন মাসে নাইরোবি বিমানবন্দরের বরাত জোটে আদানী গোষ্ঠীর।

২০২৩ সালে তানজানিয়া সফর ও মে ২০২৪ সালের মে মাসে দার এস সালেম পোর্টে কন্টেনার টার্মিনাল -২ এর বরাত পেল আদানীরা।

এইবছরে জুলাই মাসে ভিয়েতনাম সফর করলেন প্রধানমন্ত্রী আর আদানীরা সেখানকার বিমানবন্দর নির্মানে বিনিয়োগ করল। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজা বিমানবন্দরের ৭৪ শতাংশ শেয়ার আদানীদের পকেটে।

গত বছরে আমেরিকার হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যাতে আদানীরা মরিশাসে অফশোর কোম্পানি খুলে তার মাধ্যমে তারা প্রচুর টাকা আদানীদের বিভিন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে কৃত্রিমভাব সেইসব শেয়ারের দাম বাড়িয়ে দেশের মানুষের টাকা লুঠে নিয়েছিল তা জানিয়েছিল। বিশ্বের সর্ববৃহৎ কর্পোরেট প্রতারণা হিসাবে এই ঘটনা বলে মতপ্রকাশ করেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তারপর শেয়ার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবির চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচের সঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর যোগাযোগ প্রমাণ করে সরকার এই নোংরা প্রতারণার অংশীদার। অথচ সুপ্রীম কোর্ট সেবিকে দায়িত্ব দিয়েছিল হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের তোলা অভিযোগের তদন্ত করতে। আর সেবিও ক্লিন চিট দিয়েছিল আদানীদের প্রায় সব ক্ষেত্রে। সর্ষের মধ্যেই যে ভূত লুকিয়ে রয়েছে তা দিন দিন প্রকাশ হচ্ছে।

২০১৯ সালে জানা যায় ১৫ জন শিল্পপতিদের ৩৫০,০০০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করেছে বিজেপি সরকার।গত দশ বছর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের খাতা থেকে ১০,০০,০০০ কোটি টাকার ঋণ অবলোপন বা রাইট অফ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ থেকে গত নয়টি অর্থবর্ষে অনুৎপাদক সম্পদ মুছে ফেলা হয় ১৪,৫৬,২২৬ কোটি টাকা।এর মধ্যে বড় শিল্পসংস্থাদের ৭৪০,৯৬৮ কোটি টাকা।

সম্প্রতি আরেকটি খবর পাওয়া গেছে ব্যাঙ্কের কাছে মোট ৬১,৮৩২ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে শোধ করতে না পারায় দশটি সংস্থা দেউলিয়া আদালতে চলে যায়।ওই দশটি সংস্থা কিনেছিল আদানী গোষ্ঠী। সরকারের চাপে ব্যাঙ্কগুলি বাধ্য হয় মাত্র ১৫,৯৯৭ কোটি টাকায় তা রফা করতে। এর অর্থ আদানীদের স্বার্থে মকুব করে দেওয়া হল প্রায় ছেচল্লিশ হাজার কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গুলিহেলন ছাড়া কি ব্যাঙ্ক নিজ ইচ্ছায় এটা করতে পারে? আরো বহু উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যার কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা হল।

এসবের জন্য সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থায় কি প্রভাব

Scanned with OKEN Scanner

পড়েছে তা একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

২০১৯ সালে টমাস পিকোটি ও লুকাস চ্যানসেল রচিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ' lndian lncome Inequality 1922йфй2015 from British Raj to Billionire Raj, নামে প্রকাশিত হয়। এরপর পিকোটির সাম্প্রতিক প্রকাশিত 'A brief history of equality' গ্রন্থে এই তথ্যগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য কাজে লাগিয়ে পিকোটি ও চ্যানসেল ভারতের পারিবারিক আয়ের বিন্যাস সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরী করেছেন।এই বিন্যাস থেকে মাপা যায় আয়ের বৈষম্য। আয় বৈষম্য কমা বা বাড়ার আন্দাজও করা যায় তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে।বছরখানেক আগে প্যারিসের স্কুল অব ইকনমিক্সের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ড ইনইকুইলিটি ল্যাবের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে মোদীর আমলে ভারতের মানুষের আয়ের বৈষম্য তীব্রতর হয়েছে যা ব্রিটিশ আমল থেকেও ব্যাপক। এর প্রভাবে দূর্বল হয়ে পড়েছে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি,যেমন নির্বাচন কমিশন, সিবিআই, ইডি, আয়কর দপ্তর ইত্যাদি। এগুলি আজ নিজেদের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে নিরপেক্ষ না থেকে কেন্দ্রীয় সরকার,বিশেষত মোদীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে এবং দেশ আস্তে আস্তে প্লুটোক্রেসির দিকে চলে যাচ্ছে।

তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে স্বাধীনতার পর নেহেরুর কিছু নীতির ফলে মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি ও ধনীদের সম্পদ কমে গিয়েছিল মূলত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সৃষ্টি ও ব্যাপক শিল্প সৃষ্টির ফলে যুবকদের চাকুরির ব্যবস্থা হওয়ার ফলে। তাদের পে স্কেল, পিএফ, গ্রাচুইটি,শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ভাতা, পেনসন,গৃহ ভাতা ইত্যাদি দেওয়ার ফলে মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে ওঠে। কর্পোরেট কর বাড়তে থাকে। পরিকাঠামো তৈরী হয়। সস্তায় জ্বালানী, স্কুলের পড়াশোনা, হাসপাতালে চিকিৎসা,পরিবহন ব্যবস্থা,রান্নার গ্যাস ইত্যাদির সুযোগের সুফল পেয়েছে প্রধানত নিম্ন আয় ও মধ্য আয়ের পরিবারগুলি। পরবর্তীকালে মোদীর ভুল নীতি যেমন নোটবন্দী, তড়িঘড়ি করে জিএসটি চালুর ফলে মধ্যবিত্ত সমাজ ধীরে ধীরে নিম্নবিত্ত শ্রেণীতে নিয়ে যাচ্ছে। ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত ভারতে আয় বৈষম্য তীব্র গতিতে বেড়েছে। ধনীরা ক্রমাগত ধনী হয়ে চলেছে আর দরিদ্ররা আরো দরিদ্র হয়ে পড়ছে। দেশের মোট সম্পদের ১ শতাংশের হাতে ২২.৬ শতাংশ সম্পদ। বাকি মানুষেরা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। বিত্তশালী ১ শতাংশ মানুষদের গড় আয় বছরে ৫৩ লক্ষ টাকা, সেখানে ভারতীয়দের গড় আয় ২.৩ লক্ষ টাকা। আবার নীচের ৪০ শতাংশ মানুষের গড় আয় বছরে মাত্র ৭১ হাজার টাকা। অন্যদিকে সব থেকে ধনী দশ হাজার মানুষদের গড় আয় বছরে ৫০ কোটি টাকা। আশা করি দেশের আয় বৈষম্যের একটা চিত্র পরিবেশন করা গেল। মনমোহন সিং সরকার পর্যন্ত মাথা ঘামিয়েছিলেন যাতে সংস্কারের রাস্তায় বৈষম্য বাড়তে না পারে।তাই ১০০ দিনের কাজ বা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যুগান্তকারী আইন পাস করিয়েছিলেন যা কভিদের সময় মানুষকে অনেকটা অক্সিজেন জুগিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকার এসব নিয়ে কোন পদক্ষেপ নেয় নি। তারাবিশাল স্ট্যাচু, রামমন্দির, নতুন সংসদ ভবন বা সেন্ট্রাল ভিস্তার মত কম প্রয়োজনীয় নির্মাণ বন্ধ রাখে নি কভিদের সময় যখন দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। অক্সিজেনের অভাবে কাতারে কাতারে মৃত্যু হচ্ছে। সারি দিয়ে মৃতদেহ নদীর পাড়ে দাহ করা হচ্ছে, নদীতে পচা গলা মৃতদেহ ভেসে চলেছে এসব কিছুই মোদী সরকারের হৃদয়ে কোন রেখাপাত করে নি। এরপরেও কি বলতে হবে মোদী সরকার সাধারণ মানুষের সরকার?

শাসনের মুখ্য ভূমিকায় কি মহামান্য আদালত

অশোক সরকার

আদালত এখন প্রতিদিনই খবরের শিরোনামে। খবরের কাগজ বা টেলিভিশন চ্যানেল খুললেই আজকাল রোজই মহাগুরুত্বপূর্ণ খবরগুলির মধ্যে থাকে আদালতের খবর। কোন ফাস্ট ট্রাক আদালত, কোন না কোন হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের খবর প্রধানমন্ত্রীর খবরের মতই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নেয়। এ রকম তো চিরকাল ছিল না। দুতিন দশক আগে খবরের কাগজে অনেকটা ভিতরের পাতায় 'আইন-আদালত' বলে একটা কলম থাকত তাও প্রতিদিন নয়। সপ্তাহে এক দিন। দূরদর্শনে আইন নিয়ে নানা অনুষ্ঠান হত এখনো হয়, সেগুলি আইনি সচেতনতা বাড়ানোর জন্য, আদলতের খবর দেবার জন্য নয়।

আদালতের খবর এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল কেন? সেটা কি শুধুই লাইভ স্ট্রিমিং চালু করার জন্য? নাকি আইন আদালত বিষয়ে সাধারণভাবে মানুষের আগ্রহ বেড়ে গেছে? একটু খতিয়ে দেখা যাক। আমার মতে রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থায় যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি ঘটে গেছে, আদালত নিয়ে আগ্রহ তারই ফলশ্রুতি।

প্রথম কারণ সরকারের অনেক বিতর্কিত নীতি। শুধু বিজেপি-এনডিএ সরকারের নয়, পূর্বতন কংগ্রেস সরকারও এই ব্যাপারে কিছু কম যায়না। কয়লা ব্লক বিতরণ, স্পেকট্রাম বিতরণ, কুন্ডকুলাম নিউক্লিয়ার পাওয়ার, সালয়া জুডুম, মনে করুন। এছাড়া আরও কয়েকটি জনসমক্ষে স্ক্যাম বলে পরিচিত, যেমন অগাস্টা ওয়েস্টলান্ড হেলিকপ্টার, কমনওয়েলথ গেমস, ইত্যাদি। এই সরকারের ক্ষেত্রেও বিতর্কিত নীতি এবং দুর্নীতি, কোনটারই অভাব নেই। নোটবন্দী, ৩৭০, তিন-তালাক, ধর্মান্তর, এনআরসি-সিএএ, তিনটে কৃষি আইন, ইলেক্টোরাল বন্ড, অগ্নিবীর, রাফায়েল, আদানি, সেবি। রাজ্য সরকারগুলিকে ধরলে তালিকা অনেক লম্বা হবে।

বিতর্কিত নীতি ও দুর্নীতি - দুই ক্ষেত্রেই কেউ না কেউ আদালতের দ্বারস্থ হয়। বিতর্কিত নীতিগুলি অধিকাংশই জনস্বার্থ বিরোধী হয়, কাজেই নাগরিক সমাজের নানা সংগঠন সঠিক কারণেই তা আদালতে চ্যালেঞ্জ করে। দুই, স্ক্যাম, বিরোধী পক্ষের

Scanned with OKEN Scanner

রাজনীতির বড় হাতিয়ার, ওই বিষয়ে চেঁচামেচি করা ছাড়াও তাদেরি কেউ না কেই আদালতকে তার বিচার করতে বলে বা বিচারের উপর নজরদারি করতে বলে। এই ধরণের বিতর্কিত এবং দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় যদি কোন বড় নেতা, বা আমলা জড়িয়ে থাকেন, তাহলে তা সাধারণ মানুষের নজর কাড়ে, সেই খবরে মানুষের উৎসাহ বাড়ে, এবং মিডিয়ারও নজর কাড়ে। তখন আদালতের খবরের গুরুত্ব বাড়ে।

দুর্নীতির কথাটা আলাদা করে বলতেই হয়, আমাদেরই পার্থ, জোতিপ্রিয়, অনুব্রত, শেখ শাহজাহানের কাহিনী যেমন এক ধরণের দুর্নীতি, তার পাশাপাশি, পেপার লিক, ব্রিজ ভেঙ্গে পড়া, ফেক ওষুধ, মূর্তি ভেঙ্গে পড়া, ইত্যাদি -- দুর্নীতির ব্যাপকতা ও গভীরতা দুটোই দেশব্যাপী। আগে দুর্নীতি হলে সরকার নিজেই তদন্ত কমিশন বসাত, কোন মন্ত্রী নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে সরে দাঁড়াতেন, একটা দুটো আমলা ট্রান্সফার বা সাসপেন্ড হতেন। এখন যেহেতু সরকার প্রথমেই দুর্নীতি ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করে, তাই আদালতের দ্বারস্থ হতেই হয়। দুর্নীতি যেহেতু বিরোধী শক্তির বড় হাতিয়ার তাই তারা তো দুর্নীতি নিয়ে হই চই করেই, কিন্তু এখন তাদের প্রতিনিধিরা আদালতে যান। আদালত থেকে দুর্নীতির একটা সুরাহা পাবার চেষ্টা করেন। ইলেক্টরাল বণ্ড তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। একাধিক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা আদালতে গেছেন ইলেক্টরাল বণ্ডের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। আদালতের খবর আর একটা কারণে মহাগুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তা হল ইডি-সিবিআই-ইনকাম ট্যাক্স। এরা যতদিন আসল ক্রিমিনালদের পিছনে সময় ব্যয় করত, ততদিন তা জনসমক্ষে ছিল না। তারা তাদের কাজ নীরবে করত, আদালত তাই। কিন্তু গত দশ বছরে বিশেষত ২০১৯ এর পর থেকে এদের কাজ হয়েছে শুধু বিপক্ষের নেতা-নেত্রীদের জেলে পোরা। এই কাজটি তারা এমন বে-লাগাম, বে-আইনি এবং আব্রু বিহীনভাবে করে থাকে যে সবাইকেই আদালতের শরণাপন্ন হতেই হয়। আদালতকেই ফয়সালা করে বলতে হয় এই গ্রেপ্তারি সঠিক না বেঠিক। ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিষয়টি আদালতের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। প্রতিটি গ্রেপ্তারি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে তা মিডিয়ার জায়গা পায়, মিডিয়ার অধিকাংশ সেই গ্রেপ্তারি সমর্থন করে কল্প-কাহিনী বানায়, কিছু ব্যতিক্রমী মিডিয়া তার বিরোধিতা করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা প্রকাশ করে। কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই আদালত চলে আসে সামনে। আদালত কি বলছে তাই নিয়ে মানুষের কৌতূহল বাড়ে।

শুধু কি বিপক্ষের নেতা নেত্রী? গত ২০ বছরে ইউএপিএ জাতীয় কালা কানুনগুলি অসংখ্যবার ব্যবহার হয়েছে সমাজকর্মী ও ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে। জেএনইউ, জামিয়া-মিলিয়া, আলিগড়, চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাষ্ট্রের কালা কানুনের শিকার হয়েছেন, স্ট্যান স্বামী, রোনা উইলসন, সোমা সেন, আনন্দ তেলতুম্বে, জি এন সাইবাবা, ইত্যাদি বহু সমাজ কর্মী এমনকি গান্ধিবাদি নেতারাও বাদ যান নি। এঁদের গ্রেপ্তারি সব ক্ষেত্রেই আদালতে গেছে। মূল স্রোতের মিডিয়া বা বিপক্ষ দল এই নিয়ে খুব একটা সরব না হলেও নাগরিক সমাজের একটা বড় অংশ এই নিয়ে সরব হয়েছে। সৌভাগ্য এই যে সমাজ মাধ্যমে নাগরিক সমাজের সক্রিয় উপস্থিতি থাকায়, বিষয়গুলি জনসমক্ষে থেকেছে, এবং আদালতকেও তা নজরে রাখতে হয়েছে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই সমাজকর্মীরা বা ছাত্ররা বেকসুর খালাস পেয়েছেন, বা জামিন পেয়েছেন, এবং মামলা ঠাণ্ডা ঘরে চলে গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও আদালতের ভূমিকা সামনে এসেছে, মানুষ কি আদালত কি বলছে জানতে আগ্রহী থেকেছে।

সাম্প্রতিক কালে আদালতের গুরুত্ব বাড়ানোর পিছনে রাজ্যপালদেরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্যপালেরা চিরকালই কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন, এক কালে তাঁরাই সরকার ফেলতে ও গড়তে বিশেষ ভূমিকা নিতেন। ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে সরকার ফেলা হত, সেই ধারা প্রয়োগের সুপারিশ রাজ্যপালের কলমেই লেখা হত। অবশ্য মাঝে কিছুকাল ৩৫৬-র প্রয়োগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাজ্যপালেরা রাজ্য সরকারের সঙ্গে একটা সীমাবদ্ধ সমঝোতা করে চলতেন। গত দশ বছরে রাজ্যপালেরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছেন এবং তাদের সক্রিয়তা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু বা কেরালা , যেখানে শক্তিশালী বিরোধী পক্ষের সরকার রয়েছে, সেখানে রাজ্যপালেরা খোলাখুলি বিজেপি নেতার মত আচরণ করছেন, এমন সব নীতিগত ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যা স্পষ্টতই অসাংবিধানিক এবং বারবার এই সব সিদ্ধান্তগুলি আদালতে এসে ধাক্কা খাচ্ছে, নাকচ হচ্ছে। রাজ্য সরকার ও রাজ্যপালের সংঘাত এমনিতেই প্রথম পাতার খবর, তা আদালতে গেলে সেটা আরওই আলোচনার খোরাক হচ্ছে, এবং মহাগুরত্বপূর্ণ খবর হয়ে উঠছে।

দেশের আইনসভা মানে লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধানসভাগুলিই বা পিছিয়ে থাকে কেন। আইনসভাগুলিও দেখিয়ে দিল তারাও কম যায় না। দল বদলুদের ব্যাপারে স্পিকারের কাজকর্ম, লোকসভা -রাজ্যসভা থেকে সদস্যদের পাইকারি হারে বহিষ্কার, ইত্যাদি অনেক বিষয়ই আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে, আদালতকে নাক গলাতে হয়েছে। বিধানসভা - লোকসভা - রাজ্যসভায় কি হচ্ছে তা নিয়ে সাধারণ পাঠক খুব একটা মাথা না ঘামালেও, ঘটনার নাটকীয়তা, মিডিয়ায় তার প্রচার, আদালতে জজেদের চোখা চোখা প্রশ্ন , সবই আদালতের প্রতি মানুষের নজর বাড়িয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আদালত নিজেদের কাজের জন্যই নানা কারণে শিরোনামে এসেছে। চারজন সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র বিচারপতি-র প্রেস কনফারেন্স, সুপ্রিম কোর্টের একাধিক বিচারপতি-র প্রকাশ্য সরকারি পক্ষ সমর্থন, অবসর নিয়েই রাজনীতিতে নেমে পড়া, সংবিধানের বাইরে গিয়ে সনাতন ধর্মের আধারে বিচারের রায় দেওয়া (হিজাব জাজমেন্ট), বিচারপতিদের ব্যক্তিগত আচরণ (বোম্বে প্রধান বিচারপতি থাকার সময়, বিজেপি কর্মকর্তার হ্যালে ডেভিডসন বাইকে চড়ে ছবি, চন্দ্রচূড়ের বাড়ির গণেশ পূজায় প্রধানমন্ত্রীর ছবি) ইত্যাদি নানা কারণে এক সময় শীর্ষ

Scanned with OKEN Scanner

আদালতগুলির নাম হয়ে গেছিল Executive Court, যার মানে আদালতে সংবিধান নয়, সরকারের দৃষ্টিতে ন্যায় নির্ধারণ করছে। বিশেষত আগের তিনজন প্রধান বিচারপতির আমলে সুপ্রিম কোর্ট তথা হাইকোর্টগুলি এমন সব সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যা হেডলাইন হবারই যোগ্য। কাজেই স্বাভাবিক কারণেই আদালত খবরের শিরোনামে আসবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

সরকারের সঙ্গে আদালতের সম্পর্ক নানা কারণে হেডলাইন হয়েছে। আদালত বলেছে অমুক অমুক ব্যক্তিকে জজ করতে হবে, সরকার বসে রইল, এক বছর পর তাদের মধ্যে কাউকে নিযুক্ত করল, কাউকে করল না। একজন ভিন্ন লিঙ্গের বলে পদ পেলেন না, আরেকজন নাকি সরকারের সমালোচক, তাই বাদ গেলেন। তৃতীয় একজন কেন পদ পেলেন না জানাই গেল না। একজন তো দু বছরের বেশি সময় অপেক্ষা করে, তাঁর নাম ফিরিয়ে নিলেন, বললেন আমার সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে কাজ নেই। শুধু কি তাই, সরকার এমন এক আইন বানাল যাতে জজ কে হবেন তা ঠিক করবে সরকার। সুপ্রিম কোর্ট বলল তা চলতে পারে না। এই সব প্রতিটি ক্ষেত্রে জন সমক্ষে উকিলসমাজে হইচই কিছু কম হয় নি, সেই সুবাদে বড় হেডলাইন হয়েছে।

এই সব হেডলাইনের পিছনে, একটু তলিয়ে দেখলে ভারতের শাসন ব্যবস্থার কিছু মৌলিক অবক্ষয়ের কথা সামনে আসে।

আদালতের কথা দিয়েই শুরু করি। জামিন সংক্রান্ত মামলাগুলি, এবং অন্যান্য বেশ কিছু মামলার বিবরণী দেখলে এটাই স্পষ্ট হয়, সাংবিধানিক আদালত বলে পরিচিত হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের বদলে, স্পষ্টত সংবিধান বিরোধী হলেও আইনের বিধানগুলিকেই সম্বল বলে মনে করেছে। সংবিধান নাগরিক কে যে সুরক্ষা দিয়েছে তার পাশে না দাঁড়িয়ে, সুরক্ষা খর্বকারি আইনগুলির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আর অন্যদিকে সংবিধানকে আধার না করে সনাতন ধর্মকে আধার করেছে। একটা উদাহরণ এই ব্যাপারে বিশেষ আলোকপাত করে। এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটি মামলায় বিচারপতি বিবাদীর কুস্টি দেখতে চেয়েছেন, তাকে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অভিযোগ ছিল পাত্রি-র মাঙ্গলিক আছে তা পাত্র পক্ষের কাছ থেকে লুকোনো হয়েছিল, তাই পাত্র ডিভোর্স চায়। এই মামলা এলাহাবাদ হাইকোর্টে গেলে জজ বললেন কই দেখি কুস্টীতে কি লেখা আছে? ভারতীয় সংবিধানের ন্যায় বিচারের আধারের মধ্যে জ্যোতিষকে এক কণা জায়গা দেওয়া হয় নি, কিন্তু কে শোনে কার কথা।

সরকারি বিতর্কিত নীতি আর দুর্নীতি-র মূলে রয়েছে সরকারের শ্রেণী চরিত্রের কথা। নিও লিবারাল যুগে সরকার যতই সমাজ ও অর্থনীতির নানা ক্ষেত্র থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে, ততই সমাজে ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বাজার ব্যবস্থার প্রভাব বেড়েছে। এখন তা নিতান্তই প্রকট হয়ে উঠেছে। এক শিল্পপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে একটা পুরো রাজনৈতিক দল তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসে, প্রশ্ন তোলা সাংসদদের গ্রেপ্তার বা বহিষ্কার করা হয়, টেন্ডার ছাড়াই এক শিল্পপতিকে বন্দরের কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়। শিল্পপতিদের অনুকূলে পরিবেশ আইন লঘু করা হয়, পরিবেশ ছাড়পত্র মুকুব করা হয়, নেতা মন্ত্রীরা দেশের এক শিল্পপতির ফেক ওষুধের সমর্থনে প্রেস কনফারেন্স করেন - উদাহরণের অভাব নেই। তবে শুধু শিল্পপতিদের কথা বললে খুবি কম বলা হবে। বাজার ব্যবস্থার ফায়দা নিয়ে যে এলিট শ্রেণী তৈরি হচ্ছে, তার একটি অংশ ভারতে আরেকটি অংশ থাকেন উন্নত দেশগুলিতে। এই এলিটশ্রেনীর বিশেষত্ব এই যে তাঁরা একেবারেই গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন নন, এঁরা সমাজের বাকি অংশের চেয়ে নিজেদের আলাদা করে দেখেন, এবং মনে করেন সমাজের বাকি অংশটা যেন তাঁদের তাবেদার হয়েই থাকে। তাই তারা শক্তিশালী নাগরিক সমাজের অত্যন্ত বিরোধী, এমনকি গণতান্ত্রিক রীতিনীতি-র ঘোর বিরোধী। ফলে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় যে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা দায়বদ্ধতা ও গণতান্ত্রিকতার দিকে দেশ এগিয়েছিল, সেগুলি এই এলিটশ্রেণি নানা ভাবে স্যাবোতাজ করেছে। এই নিওলিবারাল এলিট খুব সচেতনভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করেছে, তার বদলে যেখানে সম্ভব প্রাইভেট বাজার নির্ভর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যেমন শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, আবাসে, বিদ্যুতে, পানীয় জলে, পরিকাঠামোয়, , কত উদাহরণ দেব। এই এলিট দেশের সম্পদের উপর পুরো দখল চায় তাই এদের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে সরকারকে ও রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা ও গনতান্ত্রিকতার মৌলিক নিয়মগুলি ভাঙতে হচ্ছে।

দলীয় রাজনীতিতেও একটা মৌলিক অবক্ষয় এখন প্রকট হয়ে উঠেছে। রাজনীতি একসময় ছিল কর্তব্য, পরে হয়ে গেল পেশা, এখন সবাই জানে রাজনীতি হল বড়লোক হবার সহজ রাস্তা, মানে ব্যবসা। রাজনীতি ব্যবসায়ে পরিণত হওয়ায়, রাজনীতির প্রেরণাটাই বদলে গেছে। দেশ গড়ব, সমাজ বদলাব, সমাজে সমতা ন্যায় আনব এই প্রেরণা থেকে সরে গিয়ে রাজনীতির মূল প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্ষমতা, পজিশন, স্ট্যাটাস, প্রিভিলেজ ইত্যাদি। ফলে রাজনীতি থেকে নৈতিকতা বিদায় নিয়েছে। এলিটের স্বার্থপরতার সঙ্গে ক্ষমতার রাজনীতি জুড়ে গিয়ে এমন এক রাজনীতি তৈরি হয়েছে, যার মূল কথা হল ক্ষমতায় থাকার জন্য গণতান্ত্রিকটা নৈতিকতা বিসর্জন দিতে হবে, প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতি ধ্বংস করতে হবে, গণতান্ত্রিক বিপক্ষকে শত্রু মনে করে তাকে নির্মূল করতে হবে, এবং যে কোন রকম বিরোধকেই দমন করতে হবে।

আদালত ও শাসনব্যবস্থা আজ এক বিশেষ সম্পর্কের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। উপরের অবক্ষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত যারা, সেই বিপক্ষ, বিবেকবান জনসমাজ, দলিত আদিবাসী ও অন্যান্য শোষিত শ্রেণীর মানুষ, যারা আজ বুঝতে পারছেন সরকার, সরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনীতিবিদ, আমলা- এঁদের থেকে পাবার কিছু নেই, এঁরা এখনো আদালতের উপর ভরসা ছাড়েন নি। এঁরা ভাবছেন আদালত যেহেতু সংবিধানের ভিত্তিতে চলে, তাই সংবিধানকে অবলম্বন করে আদালত দেশকে বাঁচাবে, হয়ত বা চালিয়েও দেবে। বর্তমান প্রধান বিচারপতির সময়ে বেশ কিছু সরকার বিরোধী কঠিন সিদ্ধান্ত মানুষের আশাকে কিছুটা জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু মূল প্রশ্ন হল আদালত কি দেশ বাঁচাতে পারবে?

লেখক ব্যাঙ্গালুরুর আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

Scanned with OKEN Scanner

ভারতে ছাত্র আত্মহত্যার বার্ষিক হারে উদ্বেগজনক বৃদ্ধি

শুভাশিস মজুমদার

ভারতে ছাত্র আত্মহত্যার ঘটনার বার্ষিক হারে উদ্বেগজনক বৃদ্ধি ঘটেছে, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং সামগ্রিক আত্মহত্যার প্রবণতাকে ছাড়িয়ে গেছে। একটি নতুন প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এন সি আর বি) - র তথ্যের উপর ভিত্তি করে, ক্ষ্মছাত্র আত্মহত্যা একটি মহামারী সুইপিং ইন্ডিয়াক্ষ্ম রিপোর্টটি ২৮ আগস্ট বার্ষিক আই সি ৩ সম্মেলন এবং এক্সপো ২০২৪-এ প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে সামগ্রিক আত্মহত্যার সংখ্যা বার্ষিক ২ শতাংশ বেড়েছে, সেখানে ছাত্র আত্মহত্যার ঘটনাগুলি সম্ভবত 'আন্ডার রিপোর্টিং' হওয়া সত্ত্বেও ৪ শতাংশ বেড়েছে। 'গত দুই দশকে, ছাত্রদের আত্মহত্যার হার উদ্বেগজনক বার্ষিক হারে ৪ শতাংশ বেড়েছে, যা জাতীয় গড়ের দ্বিগুণ। ২০২২ সালে, মোট ছাত্র আত্মহত্যার ৫৩ শতাংশ পুরুষ ছাত্র ছিল।ক্ষ্ম আই সি ৩ ইনস্টিটিউট দ্বারা সংকলিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে ২০২১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে পুরুষ ছাত্রদের আত্মহত্যা ৬ শতাংশ কমেছে এবং মহিলা ছাত্রদের আত্মহত্যা ৭ শতাংশ বেড়েছে।

'ছাত্র আত্মহত্যার ঘটনা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং সামগ্রিক আত্মহত্যার প্রবণতা উভয়কেই ছাড়িয়ে যাচ্ছে। গত এক দশকে, যেখানে ০-২৪ বছর বয়সীদের জনসংখ্যা ৫৮২ মিলিয়ন থেকে ৫৮১ মিলিয়নে কমেছে, ছাত্র আত্মহত্যার সংখ্যা ৬,৬৫৪ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৩,০৪৪।'

আই সি ৩ ইন্সটিটিউট হল একটি স্বেচ্ছাসেবক-ভিত্তিক সংস্থা যা বিশ্বব্যাপী উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে তাদের প্রশাসক, শিক্ষক এবং পরামর্শদাতাদের শক্তিশালী ক্যারিয়ার এবং কলেজ কাউন্সেলিং বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখতে সহায়তা করার জন্য নির্দেশিকা এবং প্রশিক্ষণ সংস্থানগুলির মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে।

প্রতিবেদন অনুসারে, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং মধ্যপ্রদেশকে এমন রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে ছাত্রদের আত্মহত্যার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, যা জাতীয় মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ।

দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি সম্মিলিতভাবে এই ক্ষেত্রে ২৯ শতাংশ অংশীদারিত্ব রাখে, যখন রাজস্থান, তার উচ্চতর শিক্ষা প্রশিক্ষণের পরিবেশের জন্য পরিচিত হয়ে দশম স্থানে রয়েছে। কোটার মতো কোচিং হাবগুলির সাথে যুক্ত তীব্র মানসিক চাপকে এটা নির্দেশ করে।

এনসিআরবি দ্বারা সংকলিত তথ্যগুলি পুলিশ-রেকর্ড করা প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের (এফআইআর) উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। তবে, এটা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে ছাত্র আত্মহত্যার প্রকৃত সংখ্যা সম্ভবত কম রিপোর্ট করা হয়েছে। এই কম রিপোর্ট করার কারণ হিসেবে প্রতিবেদনটি যা উল্লেখ করেছে, তার মধ্যে রয়েছে আত্মহত্যাকে ঘিরে সামাজিক কলঙ্ক এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৯ ধারার অধীনে আত্মহত্যার চেষ্টা ও সহায়তার অপরাধীকরণ।

যদিও ২০১৭ মানসিক স্বাস্থ্যসেবা আইন, মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য আত্মহত্যার প্রচেষ্টাকে অপরাধমুক্ত করে, তবুও অপরাধীকরণের বিষয়ে পূর্বের ধ্যান ধারণা ও অনুশীলন এই সংক্রান্ত রিপোর্টিংকে প্রভাবিত করে চলেছে বলে এই রিপোর্ট উল্লেখ করেছে।

'এছাড়াও, একটি শক্তিশালী ডেটা সংগ্রহের ব্যবস্থার অভাবের কারণে উল্লেখযোগ্য তথ্যের অসঙ্গতি রয়েছে, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়, যেখানে রিপোর্টিং শহুরে অঞ্চলের তুলনায় কম সামঞ্জস্যপূর্ণ,' এই রিপোর্ট জানিয়েছে।

আই সি ৩ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা গণেশ কোহলি বলেন, এই প্রতিবেদনটি আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জরুরি প্রয়োজনের দিকে নির্দেশ করে।

'আমাদের শিক্ষাগত ফোকাস অবশ্যই আমাদের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে স্থানান্তরিত করতে হবে যাতে এটি তাদের সামগ্রিক মঙ্গল ও উন্নতি ঘটায়, এবং তাদের একে অপরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করার জন্য ঠেলে না দেয়।'

অতিরিক্তভাবে, প্রতিবেদনে ছাত্র আত্মহত্যার একটি নাটকীয় বৃদ্ধির উল্লেখ করা হয়েছে। গত এক দশকে পুরুষের আত্মহত্যা ৫০ শতাংশ এবং মহিলা আত্মহত্যা ৬১ শতাংশ বেড়েছে।

'উভয় লিঙ্গের ক্ষেত্রেই গত পাঁচ বছরে গড়ে ৫ শতাংশ বার্ষিক বৃদ্ধি ঘটেছে। এই উদ্বেগজনক পরিসংখ্যানগুলি উন্নত কাউন্সেলিং পরিকাঠামো এবং ছাত্রদের আকাঙ্ক্ষার গভীরতা বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।'

'প্রতিযোগিতামূলক চাপ থেকে ফোকাস স্থানান্তরিত করে ছাত্রদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সুস্থ মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য ছাত্রদের আরও কার্যকরভাবে সমর্থন ও সহায়তা করা এবং এই ধরনের ট্র্যাজেডিগুলি প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ,ক্ষ্ম এই রিপোর্টে বলা হয়েছে।

এই একই বিষয়ে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনে অস্বাভাবিক শিক্ষাগত মানসিক চাপ, পরীক্ষায় অসফল হওয়ার আশঙ্কা, একাকীত্ব, আর্থিক দুরবস্থা, বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি ছাত্রদের আত্মহত্যার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিকার ও প্রতিরোধ করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের

Scanned with OKEN Scanner

জোর দেওয়া হয়েছে।

মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা অবশ্যই স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মীদের, ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের শেখানো উচিত। শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতার পরামর্শ নিয়মিত দেওয়া উচিত।

ছাত্রদের নেতিবাচক চিন্তা মুক্ত করতে হবে। একই সঙ্গে উৎসাহ ব্যঞ্জক মানসিকতা গঠনে লক্ষ্য রাখতে হবে। সঠিক ব্যক্তিত্ব গঠন ছাত্রদের আত্মহত্যার প্রবণতাকে প্রতিরোধ করতে পারে। খেলাধুলায় অংশগ্রহণ, শরীর চর্চা আত্মবিশ্বাস অর্জনে সহায়তা করতে পারে। দারিদ্র, গৃহহীন অবস্থা, বেকারত্ব প্রভৃতি বিষয় গুলিতেকেও গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। সামাজিক মাধ্যমের কুপ্রভাবের থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

ছাত্রদের প্রতি পরিবারের সমর্থন, তাঁদের নিয়ে অনাবশ্যক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ না করা (যা ছাত্রদের মানসিক চাপ বৃদ্ধির কারণ হতে পারে) এবং নিয়মিত পারিবারিক যোগাযোগ বজায় রাখা আত্মহত্যা প্রতিহত করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সত্যপ্রিয় ঘোষের জীবন ও সাহিত্য

দীপান্বিতা কর্মকার

''আমরা হাঁটতে থাকলাম ভিন্ন আশ্রয়ের দিকে। আক্রান্ত হলেও হতে পারে যে-বাড়ি, তাকে পাহারা দেবার জন্য, তাকে বাঁচাবার জন্য, বৈঠকখানার দরজা ধরে সেই অন্ধকারের মধ্যে রয়ে গেল দাদা। দাদার বয়স তখন ঠিক-ঠিক বাইশ।''; 'দাদার মতো দাদা', শঙ্খ ঘোষ

১৯২৪ সালে ১২ সেপ্টেম্বর (১৩৩১ বঙ্গাব্দের ২৭ ভাদ্র) পূর্ব বাংলার চাঁদপুরে মামার বাড়িতে তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন শিক্ষাবিদ, বৈয়াকরণ ও প্রধান শিক্ষক মণীন্দ্রকুমার ঘোষ ও মা অমলাবালা। বড় হয়ে ওঠা দুই বাংলা মিলে। বাবা-মায়ের বড় পুত্রসন্তান হওয়ার সুবাদে সকলের যেমন বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়ে, তেমনটাই হয় সত্যপ্রিয় ঘোষের ক্ষেত্রেও।

সত্যপ্রিয়র বাবা নানা সময়ে স্কুল বদল করে শিক্ষকতা করে, তাই তাঁদের শৈশব কাটে দাদু-ঠাকুমার কাছে। কখনও বরিশালে, তো আবার কখনও স্কটিশ চার্চ স্কুলে। নানা সময়ে বিভিন্ন কারণে ঘুরে ঘুরে পড়াশোনা চলতে থাকে ছেলেরও। ''বাবা পাকশি স্কুলে হেডমাস্টারের চাকরি নেওয়ায় ম্যাট্রিকুলেশনের টেস্ট পরীক্ষার অল্প কিছুদিন আগে স্কটিশ ছেড়ে বাবার স্কুল থেকে টেস্ট পরীক্ষা দিতে হয়েছিল কল্যাণকে, আর ফাইনাল পরীক্ষার সেন্টার পাবনা স্কুলে।'' দিদি অপর্ণা গুহ রায় 'আমার ভাই কল্যাণ' প্রবন্ধে তেমনই লেখেন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন সত্যপ্রিয়। কিন্তু আর্থিক অভাবে কলকাতায় পড়া সম্ভব হয়নি। প্রথমে ঠিক হয় সত্যপ্রিয় নিজের দাদুর কাছে থেকে পড়বেন বিএম কলেজে। কিন্তু দাদু অরাজি হন, পাছে পৌত্র ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে কমিউনিস্ট হয়ে যায়। সেই ভয়ে তাঁকে কলকাতায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত জানান দাদু। তাঁর বাবা চেয়েছিলেন ছেলে প্রেসিডেন্সি বা স্কটিশে ভর্তি হোক, কিন্তু নিজের ইচ্ছেতেই রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ভর্তি হন, আর কাকাদের ইচ্ছেয় ইন্টারমিডিয়েটে সায়েন্স পড়েন। কলকাতায় যুদ্ধের আবহে সেই সময়ে স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন আইএসসি পরীক্ষা দেন পাবনা থেকে।

এর পর অবশ্য সায়েন্স নিয়ে পড়ার ইচ্ছে আর ছিল না তাঁর। বাংলায় অনার্স নিয়ে কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি হন। সত্যপ্রিয়র বোন স্বস্তি দত্ত লিখেছেন, ''দাদা ভালো ছাত্র ছিল। কলেজে পড়ার সময়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছিল। বাবা বিরক্ত হয়েছিলেন, দাদা ছিল সাহিত্যের ছাত্র। ও পরীক্ষায় ভালো ফল করতে বাবা খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু বি.এ. পড়ার সময় যখন বাংলায় অনার্স নিয়ে কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি হল, বাবা বলেছিলেন, পাগল।'' ১৯৪৪ সালে কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ থেকে সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে সাম্মানিক স্নাতক হন। এর পরে আর এমএ পড়া হয় না। পরিবারের কথা ভেবে চাকরি নেন রেলে। বাবার অমত সত্ত্বেও, মায়ের ইচ্ছেয় কলকাতা থেকে পাকশিতে এসে যোগদান করেন চাকরিতে। এমএ পড়া তাই হলও না।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর কলকাতায় বদলি হয়ে আসেন সত্যপ্রিয়। শুরু হয় নতুন জীবনযাত্রা। কলাবাগান বস্তিতে একখানা ঘরে একটানা আট বছর কাটিয়েছেন সপরিবারে। কলাবাগান বস্তির তিনতলা সেই ঘরের বর্ণনা রয়েছে তাঁর 'তাস' গল্পে। রেলের চাকুরি সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি চলতে থাকে। ১৯৪৮ সালে অগ্রদূত পত্রিকায় 'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম', পূর্বাশা পত্রিকায় 'ঘুমাও', ১৯৪৯ সালে অগ্রণী পত্রিকায় 'গঙ্গাজল' নাটিকা বেরোয়। অগ্রণীর ফাল্গুন ১৩৫৫ সংখ্যায় 'এখানে বাতাস নেই', ওই পত্রিকারই শ্রাবণ ১৩৫৬ সংখ্যায় 'ফাটল' গল্প প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি পড়ে আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রশংসা করেন, অপর দিকে শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তিরস্কার করেন। যদিও এর পরে অগ্রণী ও গণবার্তা পত্রিকায় গল্পকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন সত্যপ্রিয়, একের পর এক গল্প এই দুই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। গল্পের চরিত্রগুলোও ছিল বাস্তবের চরিত্র, লেখকেরই কোনও আত্মীয়, বন্ধু বা সহকর্মী হয়ে উঠত গল্পের নায়ক (বা বলা যায় মূল চরিত্র)। শঙ্খ ঘোষের লেখায় জানা যায়, ''দাদার গল্প বেরোলেই আমরা ভাইবোনেরা বলাবলি শুরু করি, কাকে নিয়ে লেখা হল এবার। চরিত্রগুলি বা ঘটনাগুলির কিছু অংশ বেশ চেনাই লাগে আমাদের। কিন্তু বাইরের সেই চেনাটা গল্পের মধ্যে যখন একটা ভিতরকার চেহারা খুলে ধরে হঠাৎ, একটা মোচড় আনে, বেশ ভয় হতে থাকে আমাদের।''

Scanned with OKEN Scanner

১৯৫৬ সালের ২০ জানুয়ারি দেবেন্দ্র বিদ্যাপীঠের শিক্ষিকা শ্রীমতী ইন্দিরা রায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৯৫৭ সালের ১ মার্চ একমাত্র কন্যা তপস্যা ঘোষের জন্ম। সংসারে ও কর্মক্ষেত্রের সঙ্গেই চলতে থাকে সাহিত্যচর্চা। ১৯৫২ সালে অগ্রণী পত্রিকায় 'খেলা ভাঙ্গার খেলা' নামে ধারাবাহিক উপন্যাসের প্রথম কিস্তি বেরোয়। পরবর্তী কালে ১৯৫৬ সালে এই উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ে নাম হয় 'চার দেয়াল'। বইয়ের প্রচ্ছদ সর্বভারতীয় পুরস্কার লাভ করেছিল। সত্যপ্রিয়র উপন্যাসের সংখ্যা আট। 'গান্ধর্ব' (১৯৫৯), 'রাতের ঢেউ' (১৯৬০), 'স্বপ্নের ফেরিওলা' (১৯৯৯), 'মানপত্র' (২০০১), 'বনিতাজনম' (২০০৩)। 'বনিতাজনম' উপন্যাসটি এক গৃহবধূর অত্যাচারিত জীবনের কাহিনি। এটিই তাঁর মৃত্যুর আগে শেষ প্রকাশিত উপন্যাস। গল্পকার ও ঔপন্যাসিক ছাড়া সত্যপ্রিয়র পরিচয় প্রাবন্ধিকও। বহু পত্রপত্রিকায় অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। কখনও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য, আবার কখনও 'বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকার' বিষয়ক প্রবন্ধ। পছন্দের বিষয় ছিল রুশ সাহিত্যিক সলঝেনিতসিন। 'লুকাক্সের দৃষ্টিতে সলঝেনিতসিন' (গণবার্তা, শারদীয়া ১৩৭৮) ও 'সলঝেনিতসিন ভুলতে চান না' (ক্রান্তি, ১৯৭২) তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ।

পূর্বাশা পত্রিকা নিয়ে তাঁর সম্পাদনায় দু'টি বই প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদক সত্তার এক অনন্য পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারিতে বইমেলায় তাঁর সম্পাদনায় অনুষ্টুপে প্রকাশিত 'পূর্বাশার কথা' সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বইটির শেষে মোটামুটি সমগ্র পূর্বাশা পত্রিকার একটি বিষয়-তালিকা পাওয়া যায়। ২০০২ সালে চতুর্থ বার্ষিক লিটল ম্যাগাজিন মেলার উদ্বোধনের দিনে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে, তাঁর সম্পাদনায় 'পূর্বাশা সংকলন ১' গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এই সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ড যদিও আর প্রকাশিত হয়নি। পূর্বাশা পত্রিকা নিয়ে সত্যপ্রিয় যে ভাবে ভেবেছেন, অন্য কেউ সেই কাজটি পারতেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

স্ত্রী, বাবা, মা; এক এক করে কাছের মানুষদের হারিয়ে ফেলে লেখায় সাময়িক ভাটা পড়লেও তাঁর কলম কখনও থেমে থাকেনি। ১৯৮২ সালে চাকরি থেকে অবসর নেন। তার পর বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালিখি বাড়তে থাকে। অগ্রণী, পূর্বাশা, গণবার্তা, জঙ্গম উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যিক হিসেবে নিজের সময়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সত্যপ্রিয়। কালপ্রতিমা সাহিত্যপত্রের সভাপতি হয়েছিলেন ২০০০ সালে, আমৃত্যু এই পদ তিনি সামলেছিলেন। জীবনে বহু ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন; পুত্র, স্বামী, পিতা, রেলের কর্মচারী, সাহিত্যিক। এগুলি ছাড়াও তাঁর আর একটি পরিচয় ছিল গৃহশিক্ষক। এমএ পড়তে না পারায় তিনি অধ্যাপক হতে পারেননি বটে কিন্তু গৃহশিক্ষক হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে ছিলেন প্রিয় মাস্টারমশাই; 'জ্যেঠু'। এই ডাকেই সব ছাত্রছাত্রী তাঁকে ডাকতেন। বাংলা ও ইংরেজি, এই দু'টি বিষয়ই তিনি পড়াতেন, এবং পড়লে একসঙ্গে দু'টি বিষয়ই তাঁর কাছে পড়তে হবে, এটিই ছিল তাঁর শর্ত। বাইরের ছাত্রছাত্রী তো বটেই, এমনকী নিজের ভাইবোনের ছেলেমেয়েরাও তাঁকে শিক্ষকের ভূমিকায় পেয়েছেন।

ভ্রমণপ্রিয়, তুখোড় গল্পবাজ সত্যপ্রিয় ২০০৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, তাঁর ৭৯তম জন্মদিনের রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক মাসেরও বেশি সময় মেডিক্যাল কলেজের ডেভিড হেয়ার ভবনের চারতলায় কার্ডিয়ো-থোরাসিক বিভাগের ইনটেনসিভ থেরাপি ইউনিটে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ১৫ অক্টোবর তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

এ-বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হল। সেই উপলক্ষে গত বছর ও এ-বছর তাঁর পরিবারের তরফ থেকে স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই দুই অনুষ্ঠানে তাঁর উপন্যাস সমগ্র, প্রবন্ধ সংকলন ও গল্প সংগ্রহের দু'টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এ-ভাবেই বাঙালি পাঠকমননে আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন সত্যপ্রিয় ঘোষ।

রাতের ভারতবর্ষ

মিলি দাস

চৌদ্দই আগষ্ট
রাত বারোটা
ভারতবর্ষের আকাশ
আজ যেন মাটিতে নেমেছে।
শিশু থেকে বৃদ্ধ
লক্ষ লক্ষ মানুষ
ম্লান মুখে মোমবাতি হাতে
রাস্তায় হাঁটছে ।
আর ভেতরে ভেতরে
গুমরে উঠছে ক্লেশ।
এত মানুষের জোরালো চিৎকার
শুনেছে কখনো মাটির দুর্গা ?
বিনা পুজোয়
শঙ্খধ্বনি উলুর শব্দ !
শুনেছ কখনো ?
একদিন নয়
প্রতিটি দিন আমার দিন

Scanned with OKEN Scanner

এক রাত নয়
প্রতিটি রাত আমার রাত।

বনগাঁ থেকে বিহার
দুর্গাপুর থেকে পুরুলিয়া
বোলপুর থেকে বারাসাত
কলকাতা থেকে ক্যালিফোর্নিয়া
শহর থেকে গ্রাম
উত্তর থেকে দক্ষিণ
পূর্ব থেকে পশ্চিম
গণ আওয়াজে গর্জে উঠল
মাতৃভূমি।
গণ আওয়াজে গর্জে উঠলো
আমার ভারতবর্ষ।

ধর্ষক আজও কি বৃষ্টিভেজা
জ্যোৎস্না রাতে
আরামে ঘুমিয়ে আছে?
নাকি পুরুষাঙ্গে শান দিচ্ছে
নিজের ক্ষমতা বলে?

স্বাধীনতার আটাত্তর বছরে পৌঁছেও
জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে বলতে হয়
অধিকার চাই
আমায় অধিকার দাও
দ্য নাইট ইস আওয়ার্স।
রাষ্ট্র দুচোখ ভরে দেখছে
রাতের অন্ধকারে মানুষের বুকে কিভাবে আগুন জ্বলে!

আর কি কি চক্র চলে ওখানে?
মুখ খুললেই ধর্ষণ?
মুখ খুললেই মৃত্যু?
কিসের এত ক্ষোভ?
কেন এই নারকীয় অত্যাচার?
যন্ত্রণা শুধুই যন্ত্রণা!

বুঝতে পারছেন
রক্তের সম্পর্কই শুধু আত্মীয় হয় না
কে ছিল সে?
প্রতিটি মানুষের মনে হচ্ছে -
সে আমার প্রাণের
সে আমার কেউ
সে এই আত্মার
তাই জনতার ঢেউ,
এ আমার যন্ত্রণা
এ আমার প্রতিবাদ
এ আমার দুঃখ
এ আমার আর্তনাদ।

ইতিহাসের পাতায়
আবারো একটা নতুন অধ্যায়
সৃষ্টি হোক
দাবি একটাই
শান্তি চাই,শুধু শান্তি চাই।

আহার নিয়ে গল্পগাথা

নীহারুল ইসলাম

এক

একদা আমাদের এখানকার রথের মেলার খুব নাম-ডাক ছিল। আমরাও সেই মেলা দেখতে যেতাম পরিবারের সঙ্গে। মেলা দেখতে দেখতে পাঁপড় খেতাম, মোগলাই খেতাম, বাদাম ভাজা খেতাম, সার্কাস দেখতাম, নাগরদোলায় চড়তাম, তবে মরণকুয়ার মোটরবাইকের খেলা দেখতাম না, আওয়াজ শুনেই আমার খুব ভয় লাগত। যাইহোক, মেলা থেকে ফিরে বন্ধুবান্ধবদের সামনে পরিবারের সঙ্গে আমার মেলা দেখার গল্প করতাম। সবাই হাঁ হয়ে শুনত। আমাদের পণ্ডিতবাড়ির সবসময়য়ের কাজের লোক, আমরা বলতাম জয়নালচাচা। 'জয়নাল / ধরে হাল।' আমাদের জোতসম্পত্তির হাল যাঁর হাতের শক্ত মুঠোয় নিরাপদে ধরা ছিল। তাঁর ছোটছেলে যার্বেশ তখন আবার আমার দোস্ত। সেও শুনত আমার বলা গল্প।

জয়নালচাচা একবার আমাদের পরিবারের দেখাদেখি তাঁর ছেলেমেয়েদের রথের মেলা দেখাতে নিয়ে গিয়েছেন। সঙ্গে যার্বেশও গিয়েছিল। সেবার হল কী, মেলায় আমাদের খাওয়াদাওয়ার গল্প শুনে যার্বেশ বলে উঠল, 'মিছা কথা বুলিও না খো দোস্ত। এবার বাপুর সুথে হামরাও মেলা দেখতে গেলছিনু। তা তুমি যেসব খাবারের কথা বুল্ল্যা সেসব খাবার ভাল লয়। খেলে মুখ চুলকায়।'

আমি তো অবাক। খাবার খেলে মুখ চুলকায়! তাও আবার পাপড়-মোগলাই-বাদামভাজার মতো খাবার! এ আবার কেমন কথা ? জিজ্ঞেস করলাম, 'খাবার খেলে মুখ চুলকাবে কেনে?' যার্বেশ বলল, 'ক্যানে, ওল খেলে মুখ চুলকায় না !'

আমার মনে পড়ে 'ওল' নামের খাবারটিকে। কবে একদিন

খেয়েছিলাম। মুখ চুলকেছিল এমনই যে তারপর থেকে আমি আর ওল স্পর্শ করিনি। কিন্তু পাপড়-মোগলাই-বাদামভাজা !

আমি আবার যার্বেশকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে বুল্লে এসব খাবার খেলে মুখ চুলকায় ?' যার্বেশ বলল, 'হামার বাপু?' আবারও আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তা মেলায় যেঁই তুমরা কিছুই খাওনি দোস্ত ?' 'খাবো না কেনে? বাপু এক সের জিলিপি কিনলে। ওয়াই হামরা ভাগ করে খেনু। খানিকটা বাড়িতেই লিয়ে এনু মায়ের লেগ্যা।'

এ ঘটনা আমার একেবারে ছোটবেলাকার। যখন আমাদের বাড়িতে কাজ করে জয়নালচাচা দিনপ্রতি তিন টাকা মজুরি পেত। সঙ্গে তিনবেলা খাবার আর দশটা বিড়ি।

দুই

খলিফাবাদের নইমুদ্দিন বিশ্বাস তখন আমাদের এলাকার মস্ত বড় পাটের ব্যাপারি। আমার পণ্ডিতদাদোর সঙ্গে তাঁর খুব দোস্তি। পাটের মরশুমে রোজ সকাল সকাল দু-তিন জন মুনিষ নিয়ে এসে হাজির হতেন আমাদের বৈঠক বাড়িতে। আমরা তখন আমাদের বৈঠক বাড়িতে বারান্দার চৌকিতে বসে পণ্ডিতদাদোর নিগরানিতে লেখাপড়া করতাম। পণ্ডিতদাদোর পাশে আমাদের বাড়ির মাহিন্দার রব্বানভাই দাঁড়িয়ে থাকত। পণ্ডিতদাদো তাকে দিয়ে নানারকম ফাইফরমাশ খাটাত। যেমন নইমুদ্দিন বিশ্বাস এলেই বাড়ির অন্দর মহল থেকে চা করে আনতে বলত। নইমুদ্দিন বিশ্বাস ও তাঁর সঙ্গীরা চা খেয়ে দেশ-ঘরের দু-চারটে কথা বলে পাট কিনতে বেরিয়ে যেত। আবার সারাদিন পাট কিনে সন্ধ্যাবেলা এনে রাখত আমাদের বৈঠকবাড়ির আঙিনায়।

সপ্তাহ অন্তে নইমুদ্দিন বিশ্বাস প্রায় দশ-বারো জন মুনিষ নিয়ে আসত আমাদের বৈঠকবাড়িতে। সারা সপ্তাহের কেনা পাট গাঁট বেঁধে ভাড়ার গরুগাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যেত বাজারে কালুরামবাবুর আড়তে।

একবার খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। সঙ্গে ঘনঘোর কুয়াশা। তার মধ্যেই নইমুদ্দিন বিশ্বাস দলবল নিয়ে হাজির। পণ্ডিতদাদো তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হে নইমুদ্দিন? কেমুন ঠাণ্ডা পড়্যাছে বুলো?' নইমুদ্দিন বিশ্বাস ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'আর বুলিয়েন না পণ্ডিতসাহেব। ঠাণ্ডা তো লয়, য্যানে মুনে হোছে দুনিয়া বরফে জমে যাইবে। জান বুলে আস্ত কিছু থাকবে আর!' উত্তরে পণ্ডিতদাদো বলল, 'তা যা বুল্যাছো বটে। তা আগে গরম গরম চা খাও। তারপর পাট খরিদ করতে যেও।' বলেই দাদো বাড়ির অন্দর থেকে রব্বানভাইকে চা আনতে বলল।

কিছুক্ষনের মধ্যে ট্রে-তে করে কেটলি ভর্তি চা নিয়ে এল রব্বানভাই। সঙ্গে চিনামাটির কাপ। এক এক করে চা ঢেলে দিল সবাইকে। ঠাণ্ডার দিনে চায়ের কাপের দিকে আমাদের দৃষ্টি যাবে না, তখন অত ছোট নই আমরা পাঁচ ভাইবোন। আমরাও অমন ঠাণ্ডায় চায়ের আশা করছি। তার মধ্যেই দেখলাম, নইমুদ্দিন বিশ্বাসের দলবলের চায়ের কাপে প্রথম চুমুক দেওয়া। মনে মনে 'আহা কী আরাম বলতে যাব!' তার আগেই দেখি তিক্ত মুখে নইমুদ্দিন বিশ্বাসদের কেউ বলে উঠল, 'পণ্ডিতনী চা করতে জানে না নাকি বে? দ্যাখ কেমুন চা পুড়িয়ে দিয়্যাছে!' আসলে সেদিন হয়েছিল কী, আমার দাদী চায়ের বদলে ওদের কফি বানিয়ে দিয়েছিলেন।

তিন

পুতিন রাহেলার প্রথম শ্বশুরবাড়ির যাওয়ার সঙ্গী হল আমাদের মাইমুনানানী। মানে 'মিত-কনে' হয়ে গেল। নীল পাড় - নীল বুটিকের সাদা শাড়ি পরে পান চিবোতে চিবোতে একেবারে গরুগাড়ি চড়ে। তিনদিন পর ফিরল যখন, সবাই ঘিরে ধরল তাকে। সবার প্রচণ্ড কৌতুহল। একেক জনের একেক প্রশ্নঃ

'কী খেল্যা নানী?'

'কী দেখলা নানী?'

'প্যাট ভর্যানছিল তো?'

মাইমুনানানী যা যা দেখে এসেছিল, করে এসেছিল; গড় গড় করে সব বলে গেল। যা যা খেয়েছিল, তাও গড় গড় করে বলে গেল। শুধু একটা খাবারের নাম বলতে পারল না। তাতে অন্যেরা যা অস্বস্তিতে পড়ল তার চেয়ে বেশি অস্বস্তিতে পড়ল নানী নিজেই। তার মুখ থেকেই সবাই জেনেছে খাওয়া-ঘরের বিটি সে। দুনিয়ায় এমন কোনও খাবার নেই, যা সে চেখে দেখেনি! অথচ রাহেলার মিত-কনে হয়ে গিয়ে কী একটা খাবার খেয়েছে, সেই খাবারের নাম বলতে পারছে না। শরমের মাথায় হাত! মাইমুনানানী আর দেরি করে না, কেউ কিছু বলার আগে নিজেই বলে উঠল, 'আরে, ওই যি রথের মেলায় বিক্রি হয়। পাক দিন দিন পাক দিন দিন পুংগায় পুংগায় অস টোপায়...।'

আমরা সবাই বুঝতে পারি মাইমুনানানী জিলিপির কথা বলছেন। বয়স জনিত কারণে নামটা তার স্মরণে আসছে না। তাই বলতে পারছে না।

চার

লাড্ডুবাবুর বাড়িতে কীসের অনুষ্ঠান। সন্ধ্যায় খাওয়া দাওয়া। দাদো পণ্ডিতসাহেবের নেমন্তন্য। 'দোস্ত' বলে কথা! পণ্ডিতসাহেব 'না' করে কী করে ? বাড়ির মাহিন্দার রব্বানভাইকে বলল গরুগাড়ি সাজাতে। রব্বানভাই তো খুশিতে আত্মহারা ! এর আগে বড়

Scanned with OKEN Scanner

জোর গরুগাড়িতে মাঠ থেকে খামারবাড়িতে ফসল তুলে এনেছে। তার বেশি কিছু নয়। পণ্ডিতসাহেব টাউনে যাওয়ার দরকার পড়লে তার গরুগাড়ির গাড়োয়ান হয় সাধারণত জয়নাল সেখ। কী কারণে জয়নাল সেখ সেদিন নেই। অগত্যা রব্বানভাই। লাড্ডুবাবুর নাম শুনেছে রব্বানভাই। পণ্ডিতসাহেবের বৈঠক-বারান্দায় কখনও কখনও বসে থাকতেও দেখেছে। কী ফটফটে ফরসা রঙ লোকটার! যাইহোক, রব্বানভাই খুব খুশি! তার কতদিনের সখ; পণ্ডিতদাদোর গাড়ির গাড়োয়ান হবে সে। সেই সুযোগ আজ তার সামনে। দুপুর থেকে টাপর চাপিয়ে আচ্ছা করে গাড়ি সাজিয়েছে সে। আর বেছে নিয়েছে তিনজোড়া বলদের সেই জোড়াকে, ডাবরার দহে পড়েও যে-বলদজোড়া কাত মারে না, কুত পাড়ে না।

আমার পণ্ডিতদাদো জমিদার বাড়ি যাবেন নেমন্তন্য রক্ষা করতে। রব্বানভাই তার গাড়োয়ান। পণ্ডিতদাদো পরনে পরেছেন ধুতি-পাঞ্জাবি। পায়ে কালো রঙের পাম্প-শু। তখন বিকেল। আমি সদ্য স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছি। দেখছি পণ্ডিতদাদোর যাওয়া। আর হিংসে হচ্ছে রব্বানভাইকে। গাল পাড়ছি, শালা কত বড় ভাগ্যবান! কত রাতে ফিরেছিল, জানতে পারিনি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে জেগে প্রথম মনে পড়েছিল রব্বানভাইকে। সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে একেবারে রব্বানভাইয়ের মুখোমুখি। রব্বান তখন গুনগুন করে গাইছে চব্বিশ পরগনার 'মাধবী অপেরার' পঞ্চরসের পালার গানঃ

'বাড়ির কান্টায় সরষের ফুল
আর গেল রে মোর জাতিকুল...'

রব্বানভাইকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'রাতে লাড্ডুবাবুর বাড়ির নেমন্তন্য খেয়ে এসে আজ সকালে তুই এই গান গাইছিস যে?' রব্বানভাই গান গাওয়া বন্ধ রেখে গটগট করে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'সাধেই কী রে ভাই! গেনু জমিদারবাড়ির খানা খেতে। ভাবনু কত কী খাবো! শ্যাষ তক কিছুই খাওয়া হইল না।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেনে?' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রব্বানভাই বলল, 'হারঘের মুতোন লিল্লা মাটিতে বস্যা ছেঁড়া কলাপাতায় খাওয়া লয়। খানদানি চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া। পহিলা শালপাতা দিলে। সাথে মাটির ভাড়। সেই ভাড়ে পানি। সাথে সাথে এল লেবু, পিঁয়াজ, শসার ফালি। তার পরে পরেই আণ্ডার চপ। খুব ভুখ লেগ্যাছিল বুঝলি, পাতায় পড়তে না পড়তেই সব সাফ। কিন্তু হামি সাফ করলে হবে কী, পাতা ফাঁকা থাকার উপায় নাই। পাতায় খাবার দিবার লেগ্যা লোকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাতা সাফ হতেই ভাত পড়ে গেল। সেই সাথে মুগের ডাইল। আর পাঁচ তরকারির ঘণ্ট। কি বুলবো তোকে। যেমুন সুগন্ধ, তেমনি তার স্বোয়াদ। ওই সব খেতে খেতে হামার প্যাট ফাটার অবস্থা!' 'কী রকম?' 'বুল্লাম না তোকে? ভুখ লেগ্যাছিল খুব।' জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর?' 'তারপর আবার কী? মাছ এল, হামার খালি পাতা খালিই থেক্যা গেল, লিলাম না। গোস্ত এল, হামার খালি পাতা খালিই থেক্যা গেল, লিলাম না। চাইর-পাঁচ ধরণের মিষ্টি এল, হামার খালি পাতা খালিই থেক্যা গেল, লিলাম না। লিব কী, আর কিছু খাবো কুন প্যাটে? হামার তো প্যাট একটাই, নাকি...'

৮ বি

দীপায়ন দে

'যাদবপুর ৮বির ধর্ণামঞ্চে, ষোলো তারিখ এটা করবো আমরা। ঠিক করেছি। অ্যাক্টর তো আমরাই, স্ক্রিপ্টটা খালি রেডি করতে হবে। স্টেজ ভাড়া, লাইট আর মাইক্রোফোনের টাকা যীশুদা অলরেডি দিয়ে দিয়েছে'। এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে, থামল অরিন্দম। কিংখাব আর জুবেদ গুম হয়ে বসে আছে ঘরের কোণে। কাগজ-কাপের চা ঠান্ডা হয়ে এলো, চুমুক পেলো না এখনো। শিখা ভাঙা জানলাটায় উঠে বসেছে এক্কেবারে। বাইরে তুমুল বৃষ্টি। দূর দেখা যায় না। তবুও তাকিয়ে আছে, ভাবছে একটা মেয়ের কথা। ধর্ষিত, ছিন্ন, রক্তাক্ত কিন্তু অপরাজিত যেন, অকলঙ্কিত। সিগারেটটার মুখ মুচড়ে, দেওয়ালে ঘষে নিভিয়ে দিলেন অভিরুপ। ঠিক একটা সর্বের মিথ্যার টুঁটি টিপে মারার মতন। তারপর প্রায় স্বগতোক্তির স্বরে বললেন, 'চল এই স্ক্রিপ্টটা লিখে ফেলি আজই, আর তো মাত্র ছটা দিন মাঝখানে, তারপর আবার শুনানি'। অভিরূপ ইংরেজীর প্রফেসর। পুরো নাম অভিরূপ বসুচৌধুরি, সংক্ষেপে এবিসি। এই ঘরের এক পাশে টুলের ওপর বসে আছেন তিনি। ভাবছেন। তাঁর মনে পড়ছে প্রায় পাঁচ দশক আগের একদিন। সেও এক দ্রোহকাল।

হঠাৎ শিখা নেমে এল, বলল 'না এবিসি, বহ্নির জন্য আরেকটু অপেক্ষা করবো, ওর আইডিয়াগুলো খুব অন্যরকম। দারুন। ও বলেছে, আসবে আজ'। কিংখাব বলল, 'ছাড়তো, বড্ড জ্ঞ্যান দেয় বহ্নি, অতো শোনার সময় আছে কারুর, একশন চাই এখন। পরিষ্কার কথা, উই ওয়ান্ট জাস্টিস, ব্যাস'। শিখা তাকালো একবার। জুবেদ উঠে দাঁড়ালো, বললো 'একশন মানেই চিৎকার নয়রে, বরং শিখা ঠিকই বলছে। ভাবতে হবে আমাদের, খুব ভাবতে হবে'। অভিরূপও ভাবছিলেন, সেই একশন। ডুয়ার্সের জঙ্গল পেড়িয়ে সেই রাত কাবার করা দৌড়। জিনিষ আসছে মুঙ্গের থেকে, রাতেই নিয়ে ফিরতে হবে। সে রাতের হাটে, দুরন্ত

Scanned with OKEN Scanner

চাঁদের পিছলে পরা জ্যোৎস্নায়, জঙ্গলের আলো ছায়ায়, একবার খালি মনে হয়েছিল একটু দাঁড়াই। সেই শেষবার। তারপর মনে আছে গুলির শব্দ, আর শুধু একটা চিৎকার। আরেকটা সিগারেট ধরালেন অভিরুপ। জিজ্ঞেস করলেন জুবেদকে, 'তুই কি ভাবছিস বলনাখ'। ইতিমধ্যে বহ্নি ঢুকল ঘরে। ভিজে একেবারে একসা। আরিন্দম এগিয়ে এলো তারাতারি, বললো, 'একি, তুই এতো ভিজলি কি করে, চেঞ্জ করে নিবি?, সার্ট আছে আমার কাছে'। 'ধ্যুত, তোর মাথা খারাপ, টাইম নেই এখন। সব্বাই সব করে ফেলছে। দেখে এলাম। এতক্ষণ স্বাস্থ্য ভবনের সামনেই ছিলাম। এই বৃষ্টিতেও ওরা একচুল নড়েনি জায়গা ছেড়ে, জানিস'? জুবেদ বলে উঠলো, 'জানতাম। অথচ ওরা কেউ তো কোন দিন রাজনীতি করেনি, বল। ওরা আমাদেরই মত, কলেজপড়া, ক্লাস বাঙ্ক করা, স্বপ্ন দেখা কিছু ছাত্র। জুনিয়ার ডাক্তার। ওদের কোন দেশ নেই, কাল নেই, অক্ষ নেই। দল নেই দস্তুর নেই। তাই ওরা এখনো এক হয়ে আছে। আমি এই রকমই একজন প্রোটাগনিস্ট চাইছিলাম। যেমন ধরা যাক, একটা সাধারন ফুড ডেলিভারি বয়। যে কিনা ৮বি'র সিগনালে আটকে পড়েছে। ধর্না চলছে, মিছিল আসছে, ট্রাফিক। তারই মধ্যে আটকে ওর স্কুটার। এদিকে টাইমে ডেলিভারি না-করতে পারলে ওর মাইনের টাকা কাটা যাবে। ও কি করবে তখন?, কি ভাবছে? ও কি চাইছে মিছিলে হাঁটতে? চাইছে ধর্ণায় দাঁড়াতে?' একটু থামল জুবেদ। 'তারপর'? শুধালেন এবিসি। 'এতো লম্বা করা যাবে না স্যার, মাত্র চল্লিশ মিনিটের স্লট পেয়েছি আমরা। তারপর সংহতি সঙ্ঘকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে', বাধা দিয়ে বলল কিংখাব, 'বরং একটু ইন্টারেস্টিং করতে হবে, বিষয়টা ডিরেক্টলি ফেললে মনে হয় ভিড় টানবে। ধরুণ, এই ছেলেটাই ভীড়ে মিশে গিয়ে একটা মেয়ের পিঠে হাত রাখছে। বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে মেয়েটা, তার জামার স্ট্র্যাপখ'। বহ্নি আর শিখা ঘুরে তাকাল কিংখাবের দিকে। প্রায় তেড়ে এল অরিন্দম। আর চুপ করে গেল কিংখাব। একটু নিচু গলায় বলল, 'আরে ধ্যুত, আমি তা মিন করিনি। এই কেস রিয়েলি হয়েছে রে, বিশ্বাস কর, আরজি কর-এই'। এবিসি গলা উঁচু করে বললেন, 'আহ কি হচ্ছে বলতো, এটা গল্প নয়, একটা স্কিট। মেসেজ এলিমেন্টটা খুঁজে বের কর আগে। তারপর ঠিক করবি তার উপস্থাপনা, যে সে পিঠে হাত রাখবে না মাথায়। তোদের মনে হতে পারে, কিন্তু একটা সাধারণ মানুষ না পারে ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে তার জীবনদর্শন ভাবতে, না পারে কারুর ভিজে পিঠে হটাৎ করে হাত রাখতে। আর, না সে পারে দুম করে একটা আন্দোলনে সামিল হতে, যতক্ষণ না সে বারংবার বিরক্ত হচ্ছে, বিব্রত হচ্ছে, ইন্টিমিডেটেড হচ্ছে। যা তার অস্তিত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। এই ব্যাপক অসন্তোষ, 'ওয়াইডস্প্রেড ডিস্কন্টেন্ট'ই জনজাগরণ আনে। ঠিক যেমনটা ঘটেছিল ফরাসী বিপ্লবের সময়। এইটাকে এস্টাব্লিশ করতে হবে'। বহ্নি ভাবছিল কিছু একটা। হঠাৎ বলল, 'কিংখাব ভুল কিছু বলেনি তো। দিনের পর দিন পিঠে হাত পড়লে কিছু বলতে পারে না একটা সাধারণ মেয়ে। বুঝতে পারে এটা ব্যাড টাচ। তবুও অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করে যত দিন না সেই 'ওয়াইডস্প্রেড ডিস্কন্টেন্ট'গুলো জমতে জমতে একটা জনজাগরণ হয়। যত দিন না সেই জনজাগরন একটা আন্দোলন হয়ে ওঠে, যতদিন না সেই আন্দোলন সেই হাতটা সরিয়ে দেয়। আর ততদিনে হাতটা এসে তার জামার স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে তার অস্তিত্ত্বকেও টুকরো টুকরো করে ফেলে। কখনো মিছিলের ভিড়ের আড়ালে, কখনো অফিসে, কখনো ঘরের মশারির ভেতরে। সে চুপ করে সহ্য করে। সে তো সাধারণ মেয়ে। সে তো আর দুম করে একটা আন্দোলন করতে পারে না', আর কি করবে সে? 'ভুল বললি তুই বহ্নি', বলে ওঠে জুবেদ, 'সেটা ঐ সাধারণ ছেলেটাই পারবে। ওকে পারতেই হবে। ও ওর মাইনে, ওর চাকরি, ওর ভবিষ্যত সব চুলোয় দিয়ে ওর বাক্সের গরম পিজাটা বের করে এনে ঠুসে দেবে সেই অন্ধকারের হাত আর সেই ভিড়ের মুখটার ওপর, যাতে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায় আমাদের অস্তিত্ব-সঙ্কট। দগ্ধ হয় স্বৈরাচার আর ভোট কামুক রাজনীতি। এটাই সাধারনের অতি সাধারন অস্ত্র। এটাই মেসেজ এলিমেন্ট এবিসি। এটাই উপস্থাপিত হবে এবার।

বৃষ্টি আস্তে আস্তে কমে আসছে। এবিসি একটু হাসলেন। দ্যাখেন, হাতের সিগারেটটা নিজেই কখন নিভে গেছে। আর জ্বালালেন না সেটা। সময় এসেছে। দেশলাইয়ের কাঠি বরং অন্য কাজে লাগুক এবার। বেরোবার আগে শিখা আর জুবেদকে বলে গেলেন স্ক্রিপ্টটা রাতের মধ্যেই লিখে ফেলতে। অরিন্দম রাস্তায় নেমে বহ্নিকে ডাকল কাছে, বললো, 'যাবি? পার্কস্ট্রিটে রাত-দখল আছে আজ'। বহ্নি বললো, 'তারপর ভিড়ের মধ্যে যদি কেউ ভিজে পিঠে হাত রাখে আমার?' অরিন্দম বললো, 'ভাবিস না, হাতের চামড়া গুটিয়ে হাওয়াই চটি বানিয়ে দেব'। হাসতে হাসতে একসাথে পা এগোলো দুজনাই। রাতের কলকাতা তখন দখল হয়ে গেছে।

২১ অক্টোবর 'নাগরিক' প্রকাশিত হবে না। 'নাগরিক'-এর পরবর্তী প্রকাশ ৪ নভেম্বর।

Scanned with OKEN Scanner